হাঙর নদী গ্রেনেড
সেলিনা হোসেন

বারো ভাই-বোনের সবচেয়ে ছোট বলে বাবা আদর করে নাম রেখেছিল বুড়ি। অবশ্য আদর করে কিনা কে জানে! বুদ্ধি হবার পর থেকেই জেনে এসেছে ওর নাম বুড়ি। নামটা ওর পছন্দ হয়নি। শুনলেই শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ওর ধারণা নাম খুব সুন্দর হওয়া চাই। যেটা শুনলে মন খুশিতে নেচে ওঠে। সাড়া দিতে ভালোলাগে। সেজন্যে বাবার কাছে গিয়ে নাম বদলে দেবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বাবা ওর কথা কানেই তোলেনি। খেলার সাথীদের কাছে আবেদন করেছিল, তোরা আমাকে বুড়ি বলে ডাকিবি না।

ওরা প্রবলভাবে আপত্তি করে, না, তুই বুড়ি। বুড়ি। বুড়ি

ওরা এ নামে ডেকেই আমোদ পায়। ওকে খেপানো যায়।

ফলে বুড়ি বুড়িই রয়ে গেলো। একটা পছন্দহীন নাম নিয়ে দিন কাটাতে হয়। ঘন সবুজ কচুপাতার মতো বুড়ির মন। সে পাতায় জলের দাগ পড়ে না। হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ওকে আক্রান্ত করে না, বুড়ি নির্বিবাদে সে বেড়ি পেরিয়ে আসে।

হলদী গাঁয়ের এ বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবার সুযোগ হয়নি ওর। পশ্চিমে স্টেশনে যাবার বড় রাস্তা। পুবে খালের ধার। উত্তর-দক্ষিণে মাঠের পর মাঠ। এর বাইরে কি আছে বুড়ি জানে না। আশপাশের ঘরের ছেলেমেয়েরা দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি যায়। বুড়ির তাও যাওয়া হয়নি। বাবার কাছে কিংবা মার কাছে বায়না ধরে লাভ নেই। উল্টো বকা খেতে হয়। সংসারের ঝামেলায় মা কোথাও বেরুতে পারে না। বাবা কাউকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যায় না। বুড়ি ভীষণ নিঃসঙ্গ। একদল ভাই-বোনের মধ্যে থেকেও বুড়ির মন কেমন করে। সে মনের কথা কেউ বোঝে না। বুঝতে চায় না। যে মনের ডানা অনবরত রঙ বদলায় তাকে বুঝবে কে? খেলতে খেলতে খেলা ছেড়ে ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। ওরা ডাকতে এলে রাগ করে। কখনো গালি দেয়। অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে তোলে। তারপর একসময় খালের ধারে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে থিরথির জল কাঁপে। পানির ওপর মাথা উঁচিয়ে থাকা সবুজ ঘাসের ডগায় কাচপোকা উড়ে বেড়ায়। বুড়ি ঘোলা জলে নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা হয় না। আহা জলের স্পর্শে কী ভীষণ সুখ।

একদিন দুরন্ত কৌতূহলে জলিলের সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিল। বুড়ির জিজ্ঞাসু মনের কাছে স্টেশন মানেই রূপকথার জগৎ। সেখানকার কোনো কিছুই ও চেনে না। অথচ চিনে নেবার জন্যে আগ্রহের শেষ নেই। ওরা স্টেশনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মেল ট্রেন ঝড়ের গতিতে পার হয়ে গেলো। অত ছোট স্টেশনে মেল ট্রেন দাঁড়ায় না। বুড়ির বুকের ধুকধুকানি বেড়ে যায়। উত্তেজনায় জলিলের হাত আঁকড়ে ধরে। রেলটা শেষ বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাবার পরও ঝকঝকে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ি। বুক ভরে শ্বাস নিয়েছিল। কেমন একটা অচেনা গন্ধ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

– গাড়িটা কোথায় যায় রে জলিল?

– অনেক দূর

– অনেক দূর, কত দূর?

– আমিও কি জানি ছাই! একদিন উঠে টুস করে চলে যাব কোথাও। আর ফিরব না।

জলিল চোখ বড় করে বলেছিল–

– আমারও যেতে ইচ্ছে করে। তুই আমাকে নিবি?

– ইশ্‌ শখ কতো? তুই আমাকে নিবি? ভাগ।

জলিল ওকে ভেংচি কাটে।

বুড়ির মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও আপন মনে বলে, আমিও একদিন কোথাও চলে যাব। কোঁচড় ভর্তি নুড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল সেদিন। জলিল স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছিল বারবার। ট্রেনে চড়ার মতলবে ছিল ও। সুযোগ করে একদিন ও ঠিকই উঠবে। কিন্তু বুড়ি কিছুই করতে পারে না। মনের মধ্যে হাজারটা ইচ্ছে থাকলেই কি আর সব করা যায়? মেইল ট্রেন আকাঙ্ক্ষার পাখি হয়ে উড়ে চলে যায় একদম বুড়ির নাগালের বাইরে। হলদী গাঁর বাইরের দুনিয়াটা দেখার সাধ্যি বুড়ির নেই। কিন্তু বড় বিশ্রী এই মনটা। কোন বাধা মানে না, ছুটে চলে যায় দূর-দূরান্তে। সেদিন জলিল ফেরেনি ওর সঙ্গে। ও অন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। একা একা ফিরেছিল বুড়ি। কোঁচড় ভর্তি পাথরের নুড়ি গায়ে লেগে শব্দ করছিল। ভাল লাগছিল না ওর। তৃষ্ণার্ত মনটা বাগ মানাতে না পেরে নুড়িগুলো এলোপাথাড়ি ছুঁড়ে মেরেছিল সারাপথ। লজ্জাবতীর ঝোপে লাথি দিয়ে বাধা পেয়েছিল। তবুও ওতেই ছিল আনন্দ। মন খারাপের আনন্দ। ট্রেনের ঐ ঝিক্‌ঝিক্‌ শব্দ বুড়িকে অনেকদিন নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। বুকের তল থেকে ঐ শব্দ কেবলই ঘুম ভাঙিয়ে দিত। অন্ধকারে চোখ মেলে রেখে বুড়ির রাত শেষ হয়ে যেতো। এর বেশি কিইবা করতে পারে ও। বুড়ির মন বিগড়ে যাওয়া ইঞ্জিনের মতো থমকে থাকে। কেবলই জানতে ইচ্ছে করে খাল কোথায় শেষ হয়। পথ কোথায় ফুরিয়ে যায় আর তখনই কেমন বিচ্ছিন্ন ভাবনায় বুক মোচড়ায়। মনটা জল থৈ থৈ ঝিলের মতো ছপ্‌ছপ্‌ করে।

হলদী গাঁর ছোট পরিসরে বুড়ি একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। সমবয়সী খেলার সাথীরা যেমন ওর নাগাল পেতো না, ওকে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেত– তেমন বড়রাও ওকে কাছে টানতে পারেনি। মায়ের ডাকে ভুল করেও সাড়া দিতে চাইতো না ও। মা মনেই হেঁসেল আর এটা আনো ওটা আনো-র ফাইফরমাশ খাটা তার চাইতে খালের ধার ভালো, জামরুল গাছের তলা ভালো। আর এ জন্যেই মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো ও। বুড়ি কারো জন্যে কোনো বন্ধন অনুভব করে না। কোনদিন ভাত খেতে ডেকে না পেয়ে মা রেগে গন্‌গন্‌ করতো, এমন ছিষ্টিছাড়া মেয়ে বাপের জন্মেও দেখিনি বাবা! ওর যে কি হবে?'

বুড়ি তখন হয়তো বাগানের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে বড় বাদাম গাছের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে জিভে শব্দ তুলে তেঁতুল চাটছে। দুপুরের খাবার কথা ওর মনে নেই। একা থাকতে কি যে ভালোলাগে! বেশি লোকজনের মাঝে ওর কেমন হাঁফ ধরে যায়।

এই গাছ-গাছালি কথা বলে না বলেই বুড়ির এত প্রিয়। কোন কারণে বাড়িতে লোকজন বেশি বেড়াতে এলেই বুড়ির সুবিধে। তখন ওর কথা কেউ মনেই করে না। বুড়ির মনের অনুকূলে সব ঘটনা ঘটে বলেই বুড়ি দ্রুত মানসিক পরিণতিতে পৌঁছে গেল।

কৈশোর ফুরোবার আগেই বাবা মারা যায়। বুড়ি কিছু বুঝতে পারে না। বাবার অভাব ওকে তেমন কষ্ট দেয়নি। বাবাকে কবরে নিয়ে যাবার আগে মুখের কাপড় সরিয়ে যখন সবাইকে দেখতে ডেকেছিল বুড়িও গিয়েছিল। বাবাকে অন্যরকম লাগেনি ওর। ঘুমিয়ে থাকলে যেমন লাগত ঠিক তেমন। অন্য সবাই কেঁদেছিল দেখে ও নিজেও কেঁদেছিল। কিন্তু তীব্র বেদনাবোধ কোথাও ছিল না। কেননা বাবার খুব কাছে ও কোনদিন যেতে পারেনি। বাবাকে কেন্দ্র করে তেমন কোন গভীর অনুভূতি নেই। ভালো একটা স্মৃতিও না। অবশ্য সেজন্য বুড়ির কোন দুঃখ নেই। বরং অনাদর অবহেলায় দিব্যি বড় হচ্ছিল বলে বাবা থাকা না থাকায় বুড়ির কোনো রদবদল হয়নি। মাঠে মাঠে ঘুরে, বৈঁচি কুড়িয়ে, ধানের ছড়ায় কোঁচড় ভর্তি করে, বিলের জলে সাঁতার কেটে বুড়ির অনাদরের দিনগুলো রাতের আকাশে তারার ফুলকি। বাবার প্রয়োজন বুড়ির জীবনে কোনো দাগ কাটেনি। মাঝে মাঝে ভাবত— বাবা হয়তো জানেই না যে বুড়ি নামে তার কোনো মেয়ে আছে। বাবার স্নেহের পরোয়া করেনি ও। তার চাইতে অনেক ভালো বাইরের জগতের হাতছানি। মাঠঘাট, ঝোপঝাড়, পথ-প্রান্তরের ডাক বুড়ির নাড়িতে নাড়িতে। এমনি করে সবার অলক্ষ্যে সংসারের নিয়মের গণ্ডির বাইরে বুড়ি ছিটকে পড়ে।

কৈশোর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপত্নীক চাচাতো ভাই গফুরের সঙ্গে বিয়ে হলো বুড়ির। গফুরের বয়স নিয়ে মা-র একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু পিতার অবর্তমানে অভিভাবক বড় ভাইর কাছে সে আপত্তি টেকেনি।

তোমার ঐ দস্যি মেয়েকে কে সামলাবে মা? এতোদিন ছোট ছিল লোকের চোখে পড়েনি কিন্তু দিন দিন তো ধিঙ্গি হচ্ছে। শেষে একটা কেলেঙ্কারি না হলে বাঁচি!

বড়ভাই রেগে গিয়েছিলেন। মা বুড়ো হয়েছেন। কার কাছেই বা জোর খাটাবেন। তবু বুড়িকে একটু বুঝতে চেয়েছিলেন কিন্তু ক্ষমতা ছিল না তাঁর। মা-র বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে হয়তো খারাপ লেগেছিল তাই বড়ভাই গলা নরম করে বলেছিলেন, গফুরের সঙ্গে বিয়ে হলে খারাপ হবে না মা। তাছাড়া আমাদের চোখের ওপরই তো থাকবে। ভীন গাঁয়ে বিয়ে দিয়ে চিন্তার শেষ থাকবে না। ওর যা স্বভাব! বাপ দাদার মুখে কালি দেবে।

মা চুপ করেই থাকলেন। বড়ভাই নিজের রায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বুড়িকে কোনরকম একটা বিয়ে নামক বন্ধনের মধ্যে ঠেলে দেয়াই ছিল তার লক্ষ্য। বুড়ির স্বভাব এবং আচরণ কোনটাই তার পছন্দ ছিল না। দেখেশুনে বুড়ি নিজেই চুপচাপ ছিল। বড়ভাইর হাতে-পায়ে ধরতে ওর বাধলো। তাছাড়া নিজের মনের কাছে অন্য কারো ঠাঁই নাই যার তার জীবনে স্বামী আর কতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারবে? ও খুব একটা উৎসাহ পায় না। তেমন উত্তেজনাও বোধ করে না। শুধু বিয়েকে কেন্দ্র করে একটাই স্বপ্ন ছিল মনে। ভেবেছিল আর কিছু না হোক এক গাঁ ছেড়ে আর এক গাঁয়ে যাওয়া যাবে অন্তত। একটুখানি পাগলা হাওয়া বাইরে যাবার ডাক শোনাত। হলদী

গাঁয়ের বেড়িটা ভাঙতে পারবে। নৌকার ছইয়ের ভেতর বসে ঘোমটার ফাঁকের বিমুগ্ধ দৃষ্টি ওকে স্বস্তি দেবে। কোন অপরিচিত জনের লোমশ হাত বুড়ির জীবনের রদবদলের মাইলস্টোন হয়ে দাঁড়াবে। পানখাওয়া লাল দাঁতের হাসি ছাড়া বুড়ির জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু কোন ইচ্ছেই পূরণ হয়নি ওর। লাল নটে শাকের ক্ষেত, দোয়েলের লেজ দোলানো, শাপলার চিকন লতা, কচুরিপানার বেগুনি ফুল সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এ সব কিছুই ওর জীবনের চারপাশে আছে ঠিকই কিন্তু কারো দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নতুন করে দেখা হলো না।

চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে উত্তরের ঘর থেকে দক্ষিণের ঘরে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিল মাত্র। তাছাড়া অন্য কোন বৃহৎ পরিবর্তন ওর মধ্যে আসেনি। গফুরের দুই ছেলে। বড়টি ছয় বছরের, ছোটটির বয়স চার। ওদের সঙ্গে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ওদের কোলেকাঁখে করে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক। বিয়ের পর হঠাৎ করে ওদের মা হয়ে যাবার দরুন ভীষণ কৌতূহল হয়। কেমন অবাক লাগে। কখনো লজ্জা। ধুৎ কি বাজে ব্যাপার। দুটোকে ধরে পুকুরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। আবার কখনো নিষ্পাপ কচি মুখ দুটো ভালো লাগে। তখন এক অস্থিরতায় ছটফটিয়ে ওঠে। এ ছাড়া আর সবই ওর দেখা জগৎ। পরিচিত শ্বশুর-শাশুড়ি, পরিচিত স্বামী, চেনা-জানা ঘরদোর, জানাশোনা পরিবেশ। সুতরাং কাউকেই নতুন করে চিনবার বা জানবার সুযোগ হয়নি। কেবল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অনুভব করে একটা শক্ত লোমশ হাত ওকে আঁকড়ে ধরে আছে। তখন মনে হয় হ্যাঁ জীবনের কোথায় যেন কি ঘটে গেছে। আস্তে হাতটা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। কোন দিন চুপচাপ উঠে এসে বারান্দায় বসে থাকে। মনে হয় আরো অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, সেটা হয়নি। অন্ধকার বাঁশবনে জোনাক জ্বলে, চাঁদের আলো বারান্দায় এসে পড়ে। বুড়ির বুক ফেটে কান্না আসতে চায়। কাঁদতে পারে না, তুতুমের ডাক শুনে আবার ঘরে ঢোকে। বিছানায় উঠে আসে, গফুরের পিঠ ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। এর বেশি বুড়ির আর কিছু করার নেই। বুড়ি মানসিক দিক দিয়ে যতোই গণ্ডী লাফিয়ে পেরিয়ে যাক শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও কিছুতেই ডিঙোতে পারে না।

কোনরাতে গফুর টের পেলে জিজ্ঞেস করে— কোথায় গিয়েছিলে বুড়ি!

– বাইরে।

– কেনো?

– এমনি। ঘুম আসছিল না।

গফুর কথা বাড়ায় না। আবার ঘুমিয়ে যায়। আর বুড়ি বাকি রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দেয়। কখনো কখনো যখন গফুরের ভীষণ ইচ্ছের কাছে মতি স্বীকার করে না তখন ওর পুলক লাগে। গফুরের নরম মিনতি রেলের ঝিকঝিক শব্দের মতো মনে হয়। গফুরের বুক আঁকড়ে ধরে একটা আদুরে বিড়ালের মতো মুখ ঘষে। আর গফুরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যখন দীপ্র হয়ে ওঠে তখন অবলীলায় শান্ত হয়ে যায় ও। গফুরের বুড়ি ডাকের সঘন মাদকতায় সাড়া দেবার মতো অবস্থায় নিঃশেষ হয়ে যায়। হারিয়ে যেতে থাকে সেই না দেখা জগতটায়। অনবরত ভুলে যায় ট্রেনের ঝিকঝিকি শব্দের অতল

তলে। কেউ আর ওকে ধরতে পারছে না। আর এভাবে সকলের নাগালের বাইরে ছুটে যাওয়ার যে কী সুখ! যে না বোঝে তাকে কীভাবে বোঝাবে বুড়ি।

মাঝে মাঝে গফুর একটু অবাক হয়ে ওর কিশোরী বউকে দেখে। এই মেয়েটি ওর বউ হবে কোনদিন চিন্তা করেনি কবে যে ও বড় হলো, খেলতে খেলতে কেমন করে ওর ঘরে এসে উঠলো ভাবলে লজ্জা পায় গফুর। বুড়ির মুখের দিকে তাকাতে পারে না। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। বুড়ি তখন হেসে গড়িয়ে পড়ে।

— কি দেখ অমন করে?

— তুই সুখী হয়েছিস বুড়ি?

— সুখ কি?

বুড়ি পাল্টা প্রশ্ন করে। এ প্রশ্নের উত্তর গফুর দিতে পারেনা। উত্তর জানেও না। বুড়ির কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সামর্থ্য গফুরের নেই। হলদী গাঁয়ের ছোট পরিসরে থেকেও বুড়ি যে কোথা থেকে এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করে তা গফুর বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারে না। প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলে, তামাক আন বুড়ি। বুকটা কেমন খালি খালি ঠেকছে।

ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খেতে না পারলে গফুরের বুক অমন করে। বুড়ি তা জানে। কিন্তু সুখ কি বুড়ি নিজেও তা জানে না। ভাত রাঁধা, খাওয়া, রাত্রিবেলা স্বামীর সঙ্গে ঘুমোনো— এর নাম কি সুখ? হ্যাঁ এ যদি সুখ হয় তাহলে বেশ আরামেই আছে ও। জীবনের গতানুগতিকতায় একটা স্রোত এসে মিলেছে মাত্র। হয়তো তাও নয়। চলার পথে নুড়ি কুড়িয়ে পাওয়ার মতো। না ঠিক হলো না। ধানের ছড়া কুড়োতে কুড়োতে হাঁসের ডিম পেয়ে গেলে যেমন চিৎকার করে ওঠে তেমনি। ওর জীবনে গফুর ঐ চিৎকারের মতো একটা ধ্বনি। অব্যক্ত বিস্ময়ে, গভীর আনন্দে বুকের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ নয়। তেমন করে ওকে ওলোটপালোট করে দেয়নি। আসলে বুড়ি কোনো ঘটনাকেই প্রাধান্য দিতে চায় না। তার গুরুত্বকে আলাদা করে দেখতে বসে না। মনের সঙ্গে খুব গভীরভাবে না মিললে বুড়ি অনায়াসে তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। অথচ অন্য কোনো মেয়ে হলে জীবনের এ পরিবর্তনকে বাঁক বদলের লগ্ন বলে ধরে নিত।

হলদী গাঁয়ের গ্রামীণ আবহাওয়ায় এমন কোনো কঠিন ধাতু ছিলো না যা বুড়িকে নিরেট করতে পারত। অথচ আশ্চর্য তার মনের জোর। বুড়ি গাঁয়ের সেই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের মতো এক ভিজে মন লালন করেনি। সে মনের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উষ্ণতা বিরাজ করেছে সবচেয়ে বেশি। যেদিন বুড়ি কাঁদতো সেদিন বাড়ির সবাই ভাবতো আজ সাংঘাতিক রকমের কিছু হয়েছে। অল্পে কেঁদে ভাসিয়ে দেবার মতো মেয়ে ও নয়। অথচ কেউ বোঝে না বাহ্যিক কোনো কারণে বুড়ি কাঁদে না। ওর অন্তরের অন্তর্গত বিষাদ ওকে কাঁদায়। সে বিষাদ সামগ্রিক জীবনের পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করে অহরহ আবর্তিত হয়। কোনো সাংঘাতিক ঘটনা হয়তো কখনো ওকে আলোড়িত করে না। অথচ কোনো তুচ্ছ ঘটনা বিষাদের বরফ হয়ে ওকে জমাট করে তোলে। ছেলেবেলায় বুড়ি যখন রামধনু-রঙ পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মা'র ডাকে সাড়া দিতে ভুলে যেতো তখন মা অনুযোগ করতো— 'এ মেয়েকে নিয়ে কি যে

করবে আমি? তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে বলে রাখলাম বুড়ি? এই বুড়ি শোন, ফিরে আয়? হতচ্ছাড়া মেয়ে!' বুড়ি মা'র কথায় কানই দিতো না। মাকে ভেংচি কেটে দৌড়ে বেরিয়ে যেতো। মা পিছু ডাকতে ডাকতে দরজা পর্যন্ত আসতেন কিন্তু বুড়ি ততোক্ষণে হাওয়া। মা'র কথা শোনার মতো সময় ওর নেই। মা'র কিইবা কথা থাকতে পারে? কেবল ওকে আটকে রাখার চেষ্টা। ও তা বোঝে। আর বোঝে বলে বেড়ি ভাঙতে দুর্বার হয়ে ওঠে। মা কোনদিন ওকে শাসনের বশে আনতে পারেননি। তাই ওর বিয়ে নিয়ে ভীষণ শংকিত ছিলেন। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে বুড়ির নির্বিকারত্ব দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

ছেলেকে বলেছিলেন– 'ও যে এতো শান্ত থাকবে আমি বুঝতেই পারিনি রে?

ছেলে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিল, আমি জানতাম। বিয়ের আগে যতো যাই করুক, বিয়ের পর মেয়েরা একদম সোজা হয়ে যায়। কতো মেয়ে দেখলাম।

আড়াল থেকে ভাই আর মায়ের কথা শুনে বুড়ি মনে মনে হেসেছিল। আসলে বুড়ির যতো জ্বালা মনকে নিয়ে। সেই মন কেউ দেখতে পায় না বলেই বুড়ি কখনো ভালো, কখনো মন্দ। কখনো বিপজ্জনক, কখনো গোবেচারা। তাছাড়া ও নিজের বলয়ে থাকতেই ভালোবাসে। অকারণে যেচে কারো কাছে নিজের কথা বলা ওর একদম পছন্দ নয়। বুড়ির এই নিজস্ব ক্ষেত্র আছে বলেই তার চাষবাস আছে, ফসল ফলানো আছে, তার মাড়াই আছে, গোলায় ভরা আছে। অন্য কাউকে ওর প্রয়োজনই হয় না। মা আর ভাই এর বেশি কিইবা ভাবতে পারবে?

নিরীহ গোবেচারা স্বামী বুড়ির। কোন দিন বুড়ির মতের বিরুদ্ধে কথা বলে না। পারতপক্ষে বকে না। ঝগড়া বাধাতেও অপারগ গফুর। বরং সারাক্ষণ বুড়িকে তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় গফুরের সব কাজে। ও যেন কোন অসাধারণ বস্তুর পবিত্রতা রক্ষার্থে সর্বদা ব্যস্ত। তাই পারিবারিক কলহ কখনো দানা বেঁধে ওঠে না। বুড়ি যা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেয় গফুর। বুড়ির অন্যায় আবদার নেই, হিংসা নেই, খুঁটিনাটি বস্তু নিয়ে কারো সঙ্গে বাধে না। বুড়ির কাছে গফুরের কৃতজ্ঞতা এজন্যেই। মাঝে মাঝে ওকে আদর করতে গিয়ে কেমন থমকে যায় গফুর। ওর মুখটা খুব কাছে টেনে নিয়ে বলে– 'তোকে বিয়ে করা আমার বোধ হয় ঠিক হয়নি বুড়ি।

– কেনো?

– আমি তোর চাইতে অনেক বড়।

– বয়সে কি? খেতে দাও তো ঠিক মতো।

– কি যে বলিস?

– খারাপ কি? কথায় আছে না পেটে থাকলে পিঠে সয়।

গফুর আর কথা বলতে পারে না। এ বুড়ির অভিমান না অভিযোগ তাও বোঝা দুষ্কর। ওর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার এই এক দোষ। বিশেষ জায়গায় এসে হঠাৎ করে থেমে যেতে হয়। আর এগুনো যায় না। ওর সঙ্গে গল্প খুব একটা চলে না। কোথাও না কোথাও এসে বুড়ি এমন করে যতি টানে যে থেমে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সেটা কাজের কথাই হোক কিংবা এমনি অবান্তর কথাই হোক। হঠাৎ করে চুপ করে যায়। বেশি কথা বলতে চাইলে হুঁ-হাঁ ছাড়া জবাব দেয় না। তখন গফুর

নিরুপায় হয়ে বলে— তামাক আন বুড়ি। বুকটা কেমন খালি খালি ঠেকছে। বুড়ি হাসতে হাসতে উঠে যায়।

তবে গফুরের বয়স নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না বুড়ির। এই নিয়ে ও একদম মাথা ঘামায়নি। উঠতি বয়সের তরুণ উচ্ছ্বাসের স্বপ্ন ফুটে ওঠার আগেই গফুরের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিটকে পড়ে নির্বিবাদ হয়ে গেছে ও। ভেবে আর লাভ কি? বরং এই ভালো। নিজের মনের সঙ্গে খুনসুটি জমে বেশি। ওর কাছে গফুরের দাবি খুব নেই। গফুর ওকে তেমন বিরক্ত করে না। তবুও মাঝে মাঝে যখন গফুরের উপস্থিতি অসহ্য লাগে তখন বুকের ভেতরের দমধরা স্তব্ধতা আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদম একলা থাকতে। কার্তিক মাসের হিম-পড়া রাতে বাইরে গিয়ে বসে থাকে। বিছানায় কাঁথার নিচে গফুরের বুকের উষ্ণ আমেজ পানসে লাগে। প্রতিদিনের একঘেয়েমীতে সুখ কৈ? বাইরে পাখি ডাকে। তেঁতুল গাছের মাথার ওপর হিম ঝরে। সজনের ডাল নড়ে। বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে থাকে। ঠাণ্ডা ঝলক-বাতাস গায়ে ছোঁয়া দিয়ে যায়। যেনো বুড়ির শৈশবের কেউ অনেকদিন পর পথ ভুলে ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে এসেছে। ওর বেশ লাগে। নেশার মতো যেনো। সাধ্যি-সাধনা করে টেনে নিয়ে আসে গফুর। গফুরের কণ্ঠে মিনতিই থাকে বেশি। বয়সের অনেকটা পার্থক্যের জন্যে বুড়ির উপর অসীম মমতা গফুরের। বাহুতে জোর থাকলেও গফুর তার অপব্যবহার করেনি কোনদিন। আর সেই নীরব বদান্যে ভালোবাসায় ধরা দেবার মতো যথেষ্ট চতুরতা ছিল বুড়ির আচরণে। কখনো কখনো ভোর রাতের দিকে মাছ ধরতে বেরুতো ওরা। দিনের কড়া আলোয় দেখা পরিচিত গাঁ-টা রহস্যময় মনে হয় বুড়ির কাছে। ঠিক তেমনি অনেক দিনের জানাশোনা ভাই যেমন স্বামী হয়। ভাইকে স্বামী হিসেবে আবিষ্কার করার মতো মনে হয় গাছ-গাছালি, ঘর-বাড়ি আর জলে ডুবে থাকা প্রান্তর। বুড়ির জমাট ধরে থাকা মনের কাঠিন্যে এক পেলব ছোঁয়া দিয়ে যায়। গফুরকে মনে হয় অনেক দূরের। অনেক কালের অদেখা। কাছের মানুষ পর-পর লাগে। বাইরে এলেই বুড়ির অনুভূতি পাল্টে যায়। ও তখন উজ্জ্বল হয়— ওর চোখে-মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোয়। ঘরে ও একদম নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। বাইরে এলে সে খোলসটা দুম করে ফেটে যায়। বুড়ির কিশোরী চেহারায় প্রকৃতির মাধুর্য প্রতিফলিত হয়। বুড়ি আর বুড়ি থাকে না। ও তখন গফুরের কাছাকাছি আসে।

গফুর হেঁচকা টানে ওকে ডিঙিতে তুলে নেয়। তারপর জোরে একটা ঠেলা দিয়ে নিজে উঠে বসে। জলের বুকে এপাশ-ওপাশ করে ছোট্ট ডিঙি। গফুর ওকে ভয় দেখানোর জন্যে ডিঙির দুলুনি বাড়িয়ে দেয়। এতে ভয় যতো লাগে তার চেয়ে বেশি লাগে মজা। ওতো উদ্দাম বেপরোয়া হতেই চায়। নৌকা ডুবে গেলেই বা কি? ভাসতে ভাসতে ও চলে যেতে পারবে অন্য কোথাও। এখানে ফিরে আসার দায়ভার থাকবে না। গফুর বলে— ভয় লাগে বুড়ি?

— ভয় কিসের তুমি তো আছো?

বুড়ি সজোরে গফুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে নৌকোর ওপর।

— বাইরে এলে তুই বদলে যাস বুড়ি? ঘরে তুই যেনো কেমন মনমরা থাকিস? মনে হয় আমি তোর পর। ভালো করে কথাই বলিস না?

— বাইরটা আমার ঘর যে। বাইরে এলে আমার প্রাণ ভোমরা ছাড়া পায়।

— এজন্যেই তোকে সঙ্গে নিয়ে আসি।

গফুর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে। এ যাত্রায় বুড়ির সঙ্গে ওকে কথায় ঠকতে হয়নি। ও একটা যুৎসই উত্তর দিতে পেরেছে। গর্বে আনন্দে গফুরের বুক ভরে যায়।

শান্ত পানিতে নৌকা ভাসে। গফুর বৈঠা ছেড়ে দিয়ে বুড়িকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ির কিশোরী ঠোঁটে অপূর্ব মাধুর্য। গফুর পাগলের মতো নেশা খোঁজে। দিক ভুল হয়ে যায় গফুরের। কোনো দিশা করতে পারে না। বুড়ি এখন অনেক কাছের— অনেক উষ্ণ— অনেক স্নিগ্ধতা ভরা। আঃ বুড়ি কেনো সব সময় এমন থাকে না। নৌকা যখন অন্যদিকে ঘুরে যাবার উপক্রম হয় গফুর তখন আবার বৈঠা নেয়। ও শান্ত মেয়ের মতো চুপচাপ বসে থাকে। তখন ও নিজের মধ্যে থিতিয়ে যায়। বুড়ির ভাই বলে, গফুর বুড়িকে মাথায় তুলেছে। একেই নাচুনে মেয়ে তার উপর পড়েছে ঢোলের বাড়ি। বুড়ি ভাইর কথার জবাব দেয় না। জবাব দিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। মা এ ব্যাপারে বুড়িকে প্রশ্রয় দেয়।

ওরা ওদের মতো থাকুক না। বিয়ের পর বুড়ি যে সব মেনে নিয়েছে এই আমার কপাল। মেয়েটা শান্তিতে থাকলেই আমি বাঁচি।

মা অনেক বুড়িয়ে গেছে। চোখে ঝাপসা দেখে। তবু বুড়ির জন্য উৎকণ্ঠার শেষ নেই। শৈশব থেকেই এ মেয়েটির আচরণ মাকে বড় বেশি ভাবিয়েছে এবং এখনো ভাবায়। পাড়াপড়শি মাঝে মাঝে বুড়িকে মন্দ বলে, মেয়ে মানুষের একি স্বভাব? এইসব ভাল না বুড়ি।

বুড়ি ঝগড়া করে না। মুখের উপর জবাব দেয় না। সেই জন্য কেউ ওর সঙ্গে তেমন সুবিধে করতে পারে না। বুড়ি চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে। যারা নিজেদের ভালমন্দ বোঝে না তারা ওকে ভালোমন্দের কি বোঝাবে? ও আপন মনে হাসে। এসব কথা শুনতে ওর ভালোই লাগে। কেননা এসব কথায় ওর কিছু যায় আসে না।

গফুরের নৌকা অনেকদূর চলে এসেছে। বুড়ি হাঁটুতে মুখ গুঁজে আপন ভাবনায় মগ্ন। মা-র কথা, ভাই-র কথা, পড়শিদের কথা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সিরসিরিয়ে আঁধার ঝরে যায়। ভোর রাতের হিমেল বাতাস যাদুকরি স্পর্শের মতো মায়াময় লাগে। পড়শিরা যারা ওকে উপদেশ দেয় তারা কি বুঝবে এর মর্ম। বুড়ির ভালোলাগা ধরার সাধ্যি ওদের নেই। এখন এই মুহূর্তে বুড়ির কেবলই মনে হয় এ ডিঙি যদি খাল পার হয়ে অনেকদূর চলে যেতো? যদি বড় গাঙের ডাক শোনা যেতো? এই দেশটার কোথায় কতো কি যে আছে বুড়ির কিছুই দেখা হলো না। দূরের কোনো কুটুম এলে বুড়ি মনোযোগ দিয়ে সে জায়গার কথা শোনে। শহর কি জানে না বুড়ি। সেখানের মানুষ কেমন তাও জানে না। কতো কি যে ওর জানার বাইরে রয়ে গেলো। বুড়ি এক বুক পিপাসা নিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গফুরের ডিঙি তরতরিয়ে বয়ে যায়।

— তুই এতো কি ভাবিস বুড়ি?

— ভাবি? কি আবার ভাবি? ভাবনার কি শেষ আছে?

বুড়ির হাসি খানখান হয়ে ভেঙে গড়িয়ে যায় জলের বুকে। গফুর একটুক্ষণ থেমে সেই পুরোনো প্রশ্ন আওড়ায়: তোকে আমার বিয়ে করা ঠিক হয়নি বুড়ি?

– কেনো? এবার বুড়ি অবাক হয়।

– কেনো আবার, তোর সঙ্গে আমার বয়সের ফারাক যে অনেক।

– তাতে কি, বয়সে কি হয়? ও নতুন ভঙ্গিতে উত্তর দেয়।

– এ জন্যেইতো তোকে বুঝি না। তোর ভাবনা ধরতে পারি না। হতাম তোর বয়সী তাহলে ঠিক হতো।

গফুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

বুড়ি ঠোঁট উল্টে বলে, বুঝে কি লাভ? যার যার ভাবনা তার তার কাছে। তুমি বুঝলেই বা আমার কি এসে গেলো? আমার অতশত ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার ভাবনা কেউ বেশি বুঝতে চাইলে আমার রাগ হয়।

ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওর অকারণ উচ্ছ্বাস আজ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। নিজেও তা রোধ করতে পারছে না। বুড়ির শরীরের ঝাঁকুনিতে নৌকার দুলুনি বেড়ে যায়। গফুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কখনোই ওকে বুঝতে পারে না। এমন বাঁধা-ভাঙ্গা হাসিও কদাচিৎ দেখা যায়। গফুর হাসতে হাসতে বলে, এতো হাসিস না বুড়ি? জানিস না যতো হাসি ততো কান্না।

– ছাই। তোমার যেমন কথা। হাসি পেলে হাসবো না বুঝি?

বুড়ির হাসি আর থামে না। গফুরও অকারণে হাসে, ছোঁয়াচে হাসি। জোরে জোরে বইঠা টানে। জলের কোলে নিবিড় সান্নিধ্য খোঁজে ডিঙি এবং সঙ্গে দু'টি তৃষ্ণার্ত প্রাণও। গফুরের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বুড়ির মতো হয়ে যেতে। বুড়ির বয়সটা ফিরে পেলে গফুর পৃথিবীতে আর কিছুই চাইতো না। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মাছ ধরার জাল, ডিঙি নৌকা সব দিয়ে দিতে পারে ও। কোন দিনই হিসেবী লোক ছিল না। এখন বুড়ির সান্নিধ্য ওকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। ওকে একটু খুশি করতে পারলে বুক ভরে যায়। যখন বুড়ি মনমরা হয়ে থাকে, হাজার ডাকলেও সাড়া দেয় না, কথা বলতে চায় না তখন ভীষণ খারাপ লাগে গফুরের। কি করবে বুঝতে পারে না। ঘন ঘন হুঁকো টানা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। প্রথম স্ত্রীকে কেন্দ্র করে এমন কোন ইচ্ছেই গফুরের ছিল না। অথচ তখন দু'জনেরই ভরা যৌবন। শারীরিক অনেক মাতাল ইচ্ছে ছিলো, সান্নিধ্যে ছিল উষ্ণতা, ছিল আমেজ। কিন্তু সে বৌ গফুরের চেতনা দখল করতে পারেনি। সে সময় গফুর মাঠে মাঠে বেশি সময় কাটিয়েছে। যাত্রা শুনে রাত কাবার করে ঘরে ফিরেছে। বৌ ওকে কিছু বলেনি। কোনো অনুযোগ করেনি। বরং প্রথম বৌয়ের ভয় ছিল বেশি। সব সময় আড়ষ্ট হয়ে থাকতো। সে বৌ নিয়ে গফুরের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। দুটো ছেলে হবার পর সম্পর্ক আরো শিথিল হয়ে যায়। গফুরের মনে হতো তখন কোনো বন্ধন ছিল না। কিন্তু এখন ও একটা বন্ধনের মধ্যে আছে। এই বন্ধন ওকে যতদূর টেনে নিয়ে যাবে ততদূর যেতেই ও রাজি। বুড়ি প্রাণবন্ত, সতেজ। সংসারের অনেক কিছুই বোঝে না। তবুও বুড়িকেই বেশি ভালো লাগে গফুরের। ওর মধ্যে যেনো অতিরিক্ত কিছু আছে। কৈশোরের নোনাগন্ধে ভরপুর ওর নতুন যৌবন। মিঠে নোনতা তেতো সব মিলিয়ে নতুন কিছু। ত্রিবিধ স্বাদ অথচ একটার

সঙ্গে আর একটার অদ্ভুত যোগাযোগ। গফুর ঠিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। প্রথম যৌবনে গফুর এ স্বাদ পায়নি। তাই বুড়ির জন্যে সব সময় মন টানে। বুকটা চেপে থাকে। সারাক্ষণ একটা হারাই হারাই ভাব পাগল করে রাখে গফুরকে। মন বলে জলের টান কোনদিন বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ডিঙি বাইতে বাইতে গফুর বলে, আজ আর তোকে নিয়ে ঘরে ফিরবো নারে?

— কোনদিকে যাবে?

— যেদিকে দু'চোখ যায়।

— বেশ যাও। এই আমি চোখ বুজলাম।

— ডিঙি যদি ডুবে যায়?

— তাতে কি, তুমি তো আছো।

বুড়ি পরম নিশ্চিন্তে খালের পানি গালে মাখে। দূরে তাকিয়ে থাকে।

— আমি যদি ডাঙায় ওঠাতে না পারি?

— বুকে নিয়ে ডুবে মরতে তো পারবে।

বুড়ি হেসে গড়িয়ে পড়ে। গফুর কথা বলতে পারে না। যুৎসই জবাব খুঁজে পায় না। বুড়ির এ কথার পর আর উত্তর হয় না। গফুরের হঠাৎ মনে হয় এতটা বছর ধরে এ খালে ও নৌকা বাইছে তবুও কোথায় যেনো কি ওর দেখা হয়নি। বুড়ি সেসব নতুন করে দেখাচ্ছে। কখনো ইশারায় দেখায়, কখনো চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়।

— হাঁ করে দেখো কি?

— দেখি তোকে।

— রোজই তো দেখো।

— তাও তো দেখা হয় না।

বুড়ি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে।

— তুই অন্যরকম কেনো বুড়ি?

— কেমন?

— তা তো জানি না।

— তবে যে বললে?

— তাই তো? গফুর মাথা চুলকায়। কেমন তা কি ও নিজেও জানে? আসলে প্রকাশ করতে পারে না। প্রাণটা আইঢাই করে ফেটে গেলেও অনেক কথা বলতে পারে না।

— আমাকে নিয়ে তোমার খুব জ্বালা না?

বুড়ির কণ্ঠে ভিন্ন সুর। গফুর চমকে ওঠে।

— কে বললো?

— মাঝে মাঝে তুমি যে কেমন কথা বল?

গফুর হো-হো করে হেসে ওঠে। দমকা বাতাসের আচমকা ঘূর্ণি যেন।

— তোর জন্যে আমার মরে যেতেও সুখ রে বুড়ি?

পানির উপর ঝুঁকে পড়া তেঁতুল গাছের গোড়ায় নৌকা থামায় গফুর। নৌকা আটকানোর জন্যে লোহার শিকটা গেঁথে দেয় কাদায়। ঝোপঝাড়ে ঝোপঝাপে জায়গাটা চমৎকার। ঘরের নিরাপত্তা পাওয়া যায়। বুড়ির হঠাৎ করে ভালো লাগে।

— এখানে থামলে কেন?

— তোর জন্যে। গফুর বুড়িকে কাছে টেনে নেয়।

— জায়গাটা কি সুন্দর! মনে হয় মরি।

— তোর ভালো লাগলেই হলো।

— আঃ কি কর! চারদিকে লোকজন।

— কোথায় লোক? এখনো পুরো আঁধার কাটেনি।

গফুর বুড়ির নিষেধ শোনে না। ভোরের হিমেল বাতাস ছুটে এসে গায়ে পড়ে। চমৎকার পরশ দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তেঁতুলের ডাল গায়ের ওপর। শিরশির অনুভূতি জাগায়। যতদূর চোখ যায় সব ধোঁয়াটে দেখায়। বুড়ি অন্য কিছু ভাবতে চায় না। বুড়ি এখন নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কখনো যে জিনিসটা কাঁথার ভেতর অসহ্য লাগে কখনো নৌকার উদোম হাওয়ায় তা অনবদ্য হয়ে ওঠে। কেনো যে ভালোলাগার রঙ এত ঘনঘন বদলায়! বুড়ি আপনমনে হেসে ওঠে।

— ছাড়ো।

— না। তুই বলেছিলি না বুকে নিয়ে ডুবে মরতে? এখন মরবো। সাধ হয়েছে মরার।

— ইস্ শখ কতো! আমি কি খালের পানি যে ডুবে মরবে?

— এখন তাই।

— তাহলে মর। আমি চোখ বুজলাম।

গফুর বড় নিঃশ্বাস নেয়।

— ইচ্ছে করে তোর ঠোঁটটা কামড়ে ছিঁড়ে নিই।

বুড়ি আবার হেসে ওঠে।

মাছ মারতে এলে তুমি কামড়ে কামড়ে শালুক খাও। শালুক না খেলে না কি তোমার মাছ ধরার নেশা জমে না। তুমি শালুক দেখলে পাগল হয়ে ওঠ। আচ্ছা যখন শালুক থাকে না তখন তুমি কি খাও? তোমার নেশা কি দিয়ে আটকে রাখ?

— আঃ বুড়ি। বুড়ি-বুড়ি-বুড়ি-

গফুরের কণ্ঠ জড়িয়ে আসে। গফুরের কণ্ঠ দিয়ে আর শব্দ বেরুতে চায় না। ও এখন কোনো শব্দ চায় না। চায় নীরবতা– প্রকৃতির মায়াময় নিস্তব্ধতা।

বুড়িকে সঙ্গে আনলে মাছ মারা আর হয়ে ওঠে না গফুরের। মাছ ধরার চাইতে বেশি হয় কথা আর তারও বেশি খুনসুটি। খলুই অর্ধেকও ভরে না। এমন দিনও গেছে যেদিন শুকনো জাল শুকনোই থাকে, জলে আর ভেজে না। খলুই গড়াগড়ি যায় পাটাতনে। সেদিন গফুর ঘরে ফেরে না। বুড়িকে ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে যায় গঞ্জের হাটে। শূন্য খলুই দেখলে পড়শিরা হাসাহাসি করে। বুড়িকে বাঁকা কথা শোনায়। সেদিন বুড়ি চুপচাপ গিয়ে সলীম কলীমের পাশে শুয়ে থাকে। তখন গফুর কোথায় গেছে ও তা জানে না। মাছ ধরতে না পারলেও গফুরের কোন খেদ থাকে না। বুড়িকে নিয়ে ডিঙি বাওয়াটাই মজা। আঁধার থাকতে বেরিয়ে যায়, আঁধার কাটার আগেই ফিরে আসে। তবু কখনো কারো কারো সামনে পড়ে যায়। দু'চারটে কথা শুনলেও সেটা হজম করে নেয় গফুর। এ আনন্দ ওর জীবনে কোনদিন আসবে ও কি তা ভেবেছিল!

জীবনের এ পরিবর্তন গফুরের কাছে পরম রমণীয় মনে হয়। মাছের খলুইয়ের ওকানো-ভেজা হিসেব নিরর্থক হয়ে যায়। মনে হয় এদিন প্রতিদিন হোক। বুড়ি এমনি করে খুব কাছাকাছি এসে ধরা দিক। ঘরে বুড়ি শামুকের মতো গুটিয়ে যায়। হদিস বের করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে গফুর। বুড়ি নির্বিকার। গফুরের কাছেও ঘেঁষে না। সলীম কলীমকে নিয়ে মাতামাতি করে। গফুর কৃত্রিম অভিযোগ করে, ছেলে দু'টো তোকেই ভালোবাসে বেশি। আমাকে পর করে দিল।

— হিংসা কর?

— করিইতো। মাঝে মাঝে আমার সয় না। তুই জাদু জানিস বুড়ি।

— উঁহু মোটেই জাদু না। ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা মিলে।

— মিছা কথা। ভালোবাসা দিলেই কি অমে ভালোবাসা মিলে? মনে হয় না। নইলে আমি হাপিত্যেস করি কেনো?

গফুরের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। কণ্ঠস্বরও।

— বাবা অতো কথা বুঝি না। আমার কাজ আছে যাই।

বুড়ি গফুরের সামনে থেকে সরে পড়ে। কাছে থাকলেই কোন না কোনভাবে ধরা দিতে হবে। ইচ্ছে না থাকলেও দিতে হবে। কিছুতেই যেন গফুরের আশ মেটে না। বুড়ি সলীম কলীমকে নিয়ে নাইতে চলে যায়। মন দিয়ে ঘরের কাজ করে। বিরোধহীন দিনগুলো নির্বিবাদে গড়ায়। গফুর হাল বায়, মাছ ধরে, হাটে যায়। বুড়ি ঘর সামলায়। কখনো ঠিকঠাক সব সামলে যায়, কখনো এলোমেলো হয়ে যায়। পাড়াপড়শি, আত্মীয়-স্বজনের দু'চারটে কথা শোনে— গালমন্দ খায়। তাই বকাবকি করে। মা উপদেশ দেয়। তবুও ওসবের বাইরে বেহিসাবী কল্পনার রাশটা যখন আলগা হয়ে যায় তখন মন কেমন করে। নইলে নিজের মনের মধ্যে একটা নিপুণ সুখের খাঁচা বুনে নিয়েছে বুড়ি। নিতে বাধ্য হয়েছে। জানে এর বাইরে ওর কিছু করবার নেই। তাই পারিপার্শ্বিকের ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো, ওঠানামা, সমতল-অসমতল বিস্তার বুড়ি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বাধ সাধলো প্রকৃতি। অনুভবটা বুড়ির নিজের মনের এবং সেটা বড় বেশি তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। যে চপলতা, চাঞ্চল্য, বাইরের ডাক বুড়ির নাড়িতে সেই একই তীব্রতা ওকে ঠেলে নিয়ে যায় সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়। বিবাহিত জীবনের তিন বৎসর ভালোই কেটেছে। চার বছর থেকে শুরু হলো বুড়ির দিন গোনার পালা। মাঝে মাঝে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ওর ঘৃণা হয়। এই শরীরটা কি মা হওয়ার উপযুক্ত নয়? কেনো শরীরের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করে না? কেনো কিছু একটা নড়ে ওঠার ধাক্কায় আচমকা চমকে ওঠে না? বুড়ির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কারো কাছে খুলে বলতে পারে না মনের কথা। অহরহ নিজের ভেতরে গুমরে মরে। গফুর সন্তানের জন্য খুব বেশি উচ্চবাচ্য করে না। ছেলেতো রয়েছে। আর না হলেই বা কি? এইতো ভালো আছে বুড়ি, কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। যখন যা খুশি তখন তা করতে পারে। দিনে রাতে অনেক কাছে পাওয়া যায় ওকে। হুটোপুটি মাতামাতিতে কোনো বাধা নেই। আসলে গফুর চায় না যে বুড়ি অন্য কোথাও বাঁধা পড়ুক। ও আর কিছু নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখুক। তাছাড়া একটা বাচ্চার ঝক্কি কি কম! ধুত! দরকার নেই। বুড়ি গফুরের একলার। আর কারো

নয়। কিন্তু গফুর যাই ভাবুক না কেনো বুড়ির দিন আর কাটতে চায় না। দিন দিন নিজের মনে কুঁকড়ে যেতে থাকে। এখন বাইরে যেতেও ভালোলাগে না। ঘরেতো মন বসেই না। এখন অন্য কিছু চাই। চারটি বছরের আনন্দ উত্তেজনা বুড়ির জীবনে বোঝা হয়ে চেপে বসে। গফুর ওকে সান্ত্বনা দেয়।

– তুই এত ব্যস্ত হয়েছিস কেনো বুড়ি? ছেলেতো আমাদের রয়েছে? ওরা কি তোকে সুখ দেয় না?

– দেয় কিন্তু তেমন করে দেয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা আমার কেউ না। এবার আমার নিজের চাই। নাড়িছেঁড়া ধন চাই! আমার শরীরের ভেতর উথাল পাথাল চাই! আমার–আমার–

বুড়ি আর কিছু বলতে পারে না, মুখে কথা আটকে যায়। কেমন করে গফুরকে বোঝাবে? গফুর পুরুষ। সন্তানের উপলব্ধি এত নিবিড় করে ও কোথায় পাবে? সেজন্য মাঝ পথে বুড়ির কথা থেমে যায়, বুকের দরজা বন্ধ করে ফেলে।

বুড়ির মুখ করুণ দেখায়। সেই বাঁধ-ভাঙা হাসি কমে গেছে। চেহারার দীপ্তিময় লাবণ্যে ছায়া পড়েছে। বুড়ি আর আগের মতো নেই। বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তন গফুরকে কষ্ট দেয়। কিছু করতে না পারার অক্ষমতায় চুপসে থাকে। ভোররাতে একা একা জাল নিয়ে বেরুলে গফুর সেই উচ্ছ্বাস ফিরে পায় না। যাকে কেন্দ্র করে ওর পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। কখনো কাছে বসিয়ে বুড়িকে আদর করে সান্ত্বনা দেয়।

– ছেলের জন্যে অনেক কষ্ট সইতে হয় বুড়ি?

– জানি। কষ্ট না সইলে বুঝব কি করে মা হওয়ার কি জ্বালা। আমার আর কিইবা করার আছে? দু'বেলা রাঁধাবাড়া, খাওয়া-দাওয়া, ধান সেদ্ধ, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় খোলা? না আমার আরো কিছু চাই। ছেলে-পুলে না হলে আমি নদীতে ডুবে মরবো?

বুড়ি ফিকে হাসে। গফুর চুপচাপ বসে থাকে। এর বাইরে ওকে আর কিছু বলা যায় না। ও এখন যন্ত্রণা চায়। যন্ত্রণার ভেতর থেকে নিংড়ে আনতে চায় পরিশুদ্ধ আনন্দের ফুল। নইলে জীবন ব্যর্থ। আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। এমনকি গফুরকেও একপাশে ঠেলে রেখেছে। বুড়ি এখন আর কিছু বুঝে উঠতে চাইছে না। মা হওয়া ওর একান্ত দরকার।

মাঝে মাঝে পড়শিরা খোঁচা দেয়।

অমন ধিঙ্গি মেয়ে ধেই ধেই করে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ালে পোয়াতি হয় নাকি? হাওয়া বাতাস বলে একটা জিনিস আছে না? বেলা অবেলা আছে না? মেয়ে মানুষের সব সময় সব জায়গায় যাওয়া ঠিক নাকি?

বুড়োদের মুখ ঝামটা খেয়ে বুড়ি চুপ করে থাকে। হাওয়া বাতাস, বেলা অবেলা যত কিছুই ওরা বলুক না কেন তার সঙ্গে মা হওয়ার কি সম্পর্ক বুড়ি বুঝতে পারে না। তবু কথা বাড়াতে সাহস হয় না। অনেক কিছুই তো ও জানে না। হয়তো গূঢ় কোন কিছু থাকতে পারে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। ও এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় আবর্তিত। কিছুদিন আগে হলেও যেটা ও হেসে উড়িয়ে দিতে পারতো, এখন

কীসের যেন ভয়। যদি ওর অবিশ্বাসে ক্ষতি হয়? যদি আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হয়? বুড়ি তাই মনেপ্রাণে মুরুব্বিদের কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

শুরু হয় গ্রামের টোটকা ওষুধের ব্যবহার। যত রকমের যত কিছু থাকতে পারে কোনটাই বাদ দেয় না। যে যা বলে দ্বিধাদ্বিধায় তা বিশ্বাস করে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে। আরো দু'টো বৎসর কেটে যায়। প্রহর গোনা শেষ হয় না। আকাঙ্ক্ষাতেও ভাটা পড়ে না। বরং তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। আজকাল সলীম, কলীম যখন মা, মা বলে আবদার করে তখন মাঝে মাঝে কেমন বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঐ শব্দটা ওকে একদম বিহ্বল করে ফেলে। তারপরই বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আদর করে। কোন দিন এক ঝটকায় দূরে ফেলে দিয়ে চুপচাপ পুকুরঘাটে গিয়ে বসে থাকে। জলের বুকে মাছের ফুটকি কাটা দেখে। নিজের অস্থিরতা কমানোর চেষ্টা করে, নিজের আচরণের জন্যে লজ্জা পায়। সলীম কলীমের মলিন মুখের কথা মনে করে ওর কষ্ট হয়। তবুও নিজের সঙ্গে আপস করতে পারে না বুড়ি, বুকে আকণ্ঠ পিপাসা।

মনোবিকলনের এমনি মুহূর্তে একদিন দক্ষিণ পাড়ায় বেড়াতে এলো ওর ছোটবেলার সই নমিতা। অন্যগাঁয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ওর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয় বুড়ির। অনেকদিন পর নমিতাকে দেখে বুড়ির আনন্দের সীমা নেই। দু'জনে পানের বাটা সামনে নিয়ে পা বিছিয়ে গল্প করতে বসে।

একথা সেকথার পর নমিতাই বলে, তোর যেন কি হয়েছে বুড়ি।

– কৈ কিছু না তো?

– তুই আর আগের মতো নেই।

– বয়স হচ্ছে তো।

বুড়ি আর কথা বলতে পারে না। নমিতাও চুপ থাকে।

– তোর ছেলে পুলে কটি নমিতা?

– আটটি। এক দঙ্গল ছেলেপুলে নিয়ে সারাদিনে একটুও সময় পাই না। তুই বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছিস।

– আমি নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাই না নমিতা।

বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে নমিতার বুক মুচড়ে ওঠে।

– তুই শ্রীনাইল ধামে গিয়ে সিদ্ধপুরুষ কেশা বাবার নামে মানত কর।

নমিতার কথা বুড়ির দু'কান ভরে বাজতে থাকে। সন্ধ্যা উতরে গেছে, ঘরে আলো দেয়া হয়নি। সলীম কলীম খেলা শেষে ঘরে ফিরেছে। গফুর এখনো ফেরেনি। তবু উঠতে পারে না বুড়ি, চুপচাপ বসেই থাকে। ওর মনে হয় নমিতার কথাগুলো ঘরের চাল থেকে, বাঁশের বেড়া থেকে, পানের বাটা থেকে, ওর শাড়ির মধ্য থেকে, অনবরত উঠে আসছে। নমিতা চলে গেছে বেলা থাকতে। অথচ বুড়ি আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে।

প্রতি বৎসর শ্রীনাইল ধামে পৌষ মেলা হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষ হৃদয়ে বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে আসে। ধামের বুড়ো নিম গাছের নিচে গড়াগড়ি যায়– ধুলো মাখে মুখে বুকে গলায়। এখানে মানত করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান পায়, অসুস্থ রুগী সুস্থ হয়, ক্ষেতে ফসল ফলে, ক্ষেত পোকামুক্ত হয় ইত্যাদি। ধামের প্রতিষ্ঠাতা কেশাবাবা সিদ্ধপুরুষ। শ্রীনাইলের দশ বিশ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত তাঁর নাম কিংবদন্তির

মতো প্রচলিত পৌষ মেলায় হাজারে হাজার লোকজনের উপস্থিতি সে কথাই প্রমাণ করে। তাঁর নামে সোয়া পাঁচ আনার পুটলী ভক্তি ভরে নিম গাছের ডালে বেঁধে রাখলে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়

নমিতার অসুস্থ স্বামীকে ডাক্তার সারাতে পারেনি। সাধ্যমতো বড় বড় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল ও। জমি বিক্রি করে টাকা পয়সা খরচ করেছিল, লাভ হয়নি কিছু হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছিল ভাল হবে না বলে। বলেছিল, তোমার স্বামী যা যা খেতে চায় তা খাওয়াও গিয়ে। আর কোনো আশা নেই।

হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার পর বুক ভেঙে গিয়েছিল নমিতার। চারদিক অন্ধকার দেখছিল। সামনে বৈধব্যের এক নিরেট শূন্যতা। আর সেই সঙ্গে অভাবের বিরাট হাঁ করা গর্ত : দিশেহারা নমিতার কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি যে ধুকে ধুকে মরবে অক্ষয় দাস। ভেঙে না পড়ে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করেছিল কেবল শেষ পর্যন্ত অনেক আশা নিয়ে শ্রীনাইল ধামে গিয়েছিল। তারপর থেকে আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে অক্ষয় দাস। এখন একদম ভালো সে সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নমিতার কণ্ঠ ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। অদৃশ্য সে মহান পুরুষের প্রতি প্রণাম জানায়। সেই তাঁর সিঁথির সিঁদুর হাতের শাঁখা অক্ষয় রেখেছে। আঁচলে চোখের জল মুছে নমিতা বলেছিল, খাওয়াতে পারি না তবু যে ভগবান আমাকে কেনো এতো ছেলেপুলে দেয়।

বুড়ি চমকে নমিতার মুখের দিকে তাকায়।

খাওয়া পরার বড় কষ্ট রে বুড়ি। মানুষটা এতোগুলো পেটের অন্ন জোগাতে পারে না। ভগবানকে রাতদিন বলি আর না। তবু আবার এসে গেছে, মাস তিনেক চলছে।

বুড়ি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। নমিতা চলে গেছে অনেকক্ষণ। বুড়ি এসবই ভাবে। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায় : নমিতার অক্ষয় দাস বেঁচে গেছে, নমিতা বেঁচে গেছে। ওর মতো গভীর বিশ্বাস না থাকলেও বুড়ি সব কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। আশায় আকাঙ্ক্ষায় দুলে ওঠে ওর দুর্বল মন। সত্যি যদি কিছু ঘটে, সত্যি যদি কোনো অলৌকিক শক্তি ওর জীবনের মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়ে যায়। নমিতার পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ি একটা অবলম্বন খুঁজে পায়। নিজের ভিতটা পাকা করে। কিন্তু পরক্ষণেই নমিতার রুগ্ন-দারিদ্র্যে ভরা চেহারার কথা মনে হলে বুক কাঁপে করে ওঠে। খাওয়াতে পারি না তবু যে এত ছেলেপুলে ভগবান কেনো আমাকে দেয়। ওহ্ নমিতারে তোর কষ্ট আমি বুঝি না। আমি তোর মতো হতে চাই নমিতা। শ্রীনাইল ধামের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যে প্রবল তাগিদ অনুভব করে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা সেই পরিচিত প্রবাদটা যেন আজ বুড়ির কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। কিন্তু পৌষ মেলার এখনো আট মাস বাকি। বুড়ি অন্ধকারে খড়ের স্তূপের দিকে তাকায়, জমাট অন্ধকার কেমন লেপটে আছে।

ঐ সলীমের মা ঘরে আলো দিসনি কেনো? কি অলুক্ষণে কাজ কারবার যে মেয়েটার। সন্ধ্যা উতরে গেলো তবু সাঁঝের বাতি নেই ঘরে।

বুড়ি পানের বাটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। সলীম কলীম দৌড়ে এসে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে।

— মা, মাগো—

— আরে ছাড়, ছাড়! অমন করে ধরলে পড়ে যাবো তো?

— খিদে পেয়েছে মা?

— চল খেতে দিচ্ছি।

বুড়ি ঘরে আলো জ্বালে। কুপির সেই শিখার দিকে তাকিয়ে বুড়ির কেবলই মনে হয়, পৌষ মেলার এখনো আট মাস বাকি। এই দীর্ঘ সময়ের কথা ভেবে ও ক্লান্তি অনুভব করে।

এর মাঝে একদিন দোতরা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নীতা বৈরাগিণী এসে উপস্থিত হয়। বুড়ির সঙ্গে ওর অনেকদিনের হৃদ্যতা। গফুরের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই। নীতাকে দেখলেই ওর পিছু নিত বুড়ি। হাঁটতে হাঁটতে নীতার সঙ্গে অনেক দূরে যেতো। এক সময় নীতা ওকে ভাগিয়ে দিতো।

— ঘরে যা বুড়ি?

— না। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

নীতা হা হা করে হাসতো। বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো, পাগল। ঘরে যা। তোর জন্যে ঘর আছে। আমার তো ঘর নেই রে।

বুড়ি নীতার কথা বুঝতো না। কেন ওর ঘর নেই এ কথাও বুঝতো না। কিন্তু নীতা ওকে গাঁয়ের ঐ শিমুল গাছ পর্যন্ত আসতে দিত, তারপর আর না। ঐ গাছের পর আর কিছুতেই যেতে পারত না বুড়ি। ঐটুকুই ছিল ওর সীমানা। নীতা বৈরাগিণী সোজা রাস্তায় না গিয়ে মেঠো পথে অন্য গাঁয়ে যেত। বুড়ি সেদিকে চেয়ে থাকত। নীতা গাছ-গাছালির আড়ালে হারিয়ে যাবার পরও শিমুল গাছের গোড়ায় বসে থাকত ও। ঘরে ফিরতে পারত না।

এখনো এ গাঁয়ে এলে বুড়ির সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যায় না নীতা। বয়সের বেশ একটা ব্যবধান সত্ত্বেও বুড়ির সঙ্গে ওর সখিভাব। আজও উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে দোতরার টুংটাং বাজনার সঙ্গে নীতার কণ্ঠ এক চমৎকার মিড় রচনা করে—

কঠিন বন্ধুরে—
সুখে না রহিতে দিলা ঘরে
সাজাইয়া পাগলের বেশ
ঘুরাইলে দেশ দেশান্তরে
সুখে না রহিতে দিলা ঘরে—

নীতার উপস্থিতি টের পেয়ে বুড়ি চুলোর তরকারীর হাঁড়ি নামিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে উঠোনে। সজনে গাছের নিচে বসা ক্লান্ত শ্রান্ত ধুলোমাখা নীতার চেহারা দেখে বুড়ি থমকে দাঁড়ায়। নীতাকে কেমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, তেলহীন রুক্ষ চুলে জটা ধরেছে। বুড়িকে দেখেই বলে, জল দে সই?

বুড়ি ঘটিতে করে পানি নিয়ে আসে। নীতা ছোঁ মেরে নিয়ে ঢকঢক করে শেষ করে ফেলে।

— অনেক দূর থেকে আসছি সই। তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। পথে কোথাও দাঁড়াইনি। ভাবলাম তোর কাছে গিয়ে একবারে জল খাব।

— ভালোই করেছিস। কতদিন তোর কথা ভেবেছি আমি। চল ঘরে চল।

— না এখানেই বসি। এই গাছের ছায়াই ভালো। তাছাড়া এমন শীতল হাওয়া ঘরে কি পাব? এতক্ষণে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো।

নীতা কোমরে গুঁজে রাখা তামাক বের করে চিবোয়। শ্রান্তির ভাব কেটে যাচ্ছে। ভীষণ ভালো লাগছে। বুড়ি যেন ওর মায়ের পেটের বোন। এখানে এলেই নীতা বদলে যায়।

— এত্তোদিন আসিস নি যে সই?

— অনেকদিন হলো না? অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। তোর কাছে এলে সময়টা বড়ো ভালো যায় রে?

বুড়ি ওর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসে। তারপর সজনে গাছের সঙ্গে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে থাকে।

— এতদিন কোথায় ছিলি সই?

— গিয়েছিলাম মনের মানুষের খোঁজে।

— খোঁজে কেনো? তোর মনের মানুষ রামদাস কৈ?

— মরে গেছে।

— মরে গেছে? কি বলিস?

নীতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, সত্যি।

— কি হয়েছিল?

বুড়ি চুলোর তরকারির কথা ভুলে গিয়ে ওর সামনে উবু হয়ে বসে। নীতা দোতরায় টুং টাং করে। মাথা ঝুঁকে থাকে কোলের ওপর।

— ওটা রাখ সই? কি হয়েছিল বল্?

— কি হয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। সাতদিন একনাগাড়ে জ্বর ছিল। সেদিনটা ছিল আষাঢ়ের শেষ। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল।

— সাগরেদ সুবল ছিল আমাদের সঙ্গে। চোখ বুঁজে শুয়েছিল রামদাস। জ্বলছিল কুপি। দরজার পিঠে হেলান দিয়ে বসেছিল সুবল। বাইরে সোমেশ্বরীর বুকে— দেবদারুর পাতায় বৃষ্টির একটানা শব্দ আমি শুনছিলাম। ভেতরে অসুস্থ রামদাস বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। আমার মনটা যেন কেমন করছিল। বারবার রামদাসের মুখের উপরে ঝুঁকে দেখছিলাম— দোতরাটা নাড়াচাড়া করছিলাম— কখনো জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলাম আকাশের দিকে।

— সুবল জিজ্ঞাসা করেছিল, অমন ছটফট করছো কেনো?

— আমি ওর সঙ্গে কথা বলিনি। আমি দেখছিলাম রামদাসের মুখের আঁধার, গাল দুটো গর্তে বসে গেছে। মুখের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ও বুঝি আর বাঁচবে না। সময় ফুরিয়ে এসেছে। মানুষের মুখ যে মৃত্যুর আগে অমন হয়ে যায় আমি আগে আর তা কোনদিন দেখিনি সই। রামদাস এক সময় চোখ মেলে আমাকে বলল, দোতরাটা বাজাত নীতা।

— আমি একটু অবাক হলাম। ডাকলে সাড়া দিচ্ছিল না— দেখে মনে হচ্ছিল হুঁশ নেই, অথচ আমাকে দোতরা বাজাতে বলে। আমি দু'একবার নাম ধরে ডাকলাম। সাড়া দিল না। কি আর করি দোতরা টেনে নিয়ে বসলাম। মন ঠিক ছিল না। হাত

কাঁপছিল। বুকের ভেতর ভয় করছিল সই। বারবার চেষ্টা করেও সেদিন ঐ দোতরায় সুর ওঠাতে পারিনি। কেবল মনে হচ্ছিল, এ যন্ত্রটা আমি কোনদিন বাজাতে শিখিনি রামদাসের কাছে আমি শিখিনি দোতরা ধরা।

নীতা চোখ মোছে। বুড়ির গলাও ধরে আসে। কথা বলতে পারে না। স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে সোমেশ্বরীর পাড়ে এক ছোট্ট কুটির। নীতার মুখে বহুবার সেই কুটিরের গল্প শুনেছে বুড়ি। শুনতে শুনতে ওর যেন সব কিছু চেনা হয়ে গেছে। চোখ বুজলেই সেইসব দৃশ্য দেখতে পায়। আরো শুনেছে রামদাসের কথা। রামদাস ওর মনের মানুষ। বিয়েকে ওরা স্বীকার করে না। বিয়ে ওদের কাছে কেবল অনুষ্ঠান। ওতে ওদের প্রয়োজন নেই। ওদের কাছে মনের মানুষই সত্য। কখনো দেবদারুর ছায়ায় বসে কিংবা সোমেশ্বরীর বুকে পা ডুবিয়ে দোতরা বাজায় ওরা। কেউ কোনো কথা বলে না। কোন পাখি ডাকে না। বাতাসের শনশন থাকে না। শুধু দোতরার টুংটাং মূর্ছনা দেবদারুর পাতায় পাতায় অপরূপ মিড় বুনিয়ে যায়। সেই কুটিরের চারদিকে আছে শান্ত সবুজের অবিচল নিষ্ঠা। দূরে মেঘালয়ের অস্পষ্ট পাহাড়ের হাতছানি। নীলাভ দেখায় সে পাহাড়ের মাথা। নীতার কাছে গল্প শুনলে বুড়ির বুকের ভেতর কাঁপন জাগে, অজানা সুখের কাঁপন। মনে হয় ও যেন নীতা হয়ে গেছে। ওর জীবনে কোথাও আর কোন বাধা নেই। চলেছে পথে পথে, গ্রাম থেকে গ্রামে, সঙ্গে ওর মনের মানুষ। সে মনের মানুষের জন্যে বিয়ে নামক অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। লোক-লজ্জার বালাই নেই, শুধুই নিজের মনের চলা। ভাবতে গিয়ে বুড়ি উদাস হয়ে যায়।

নীতা জল খায়। মুখ মুছে বলে, তোর শুনতে খারাপ লাগছে সই?

– না তুই বল। তোর কথা শোনার জন্যে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি।

– জানিস সেদিন ভয়ানক বেসুরো বেজেছিল রামদাসের সুরের দোতরা। কেন যে অমন বাজছিল আমি নিজেও তা বুঝতে পারিনি। একসময় রামদাস চোখ খোলে। হাত বাড়িয়ে দোতরাটা টেনে নেয়। সুবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা তোকেই দিলাম সুবল। তুই ধারাবি। তারপর রামদাস আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার দোতরায় তুই আর সুর তুলতে পারবি না নীতা।

আমার চোখে জল এসেছিল। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল সই। আমি রামদাসের হাত আমার বুকে চেপে ধরেছিলাম। ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম।

– আমার কেন এমন হলো রামদাস?

ও সে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

– আমার আর সময় নেই রে। তুই তোর মনের মানুষ খুঁজে নিস।

রামদাস ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বসায়। মাথায় হাত রাখে। বলে, কাঁদিস না। চোখের জল সইতে পারি না। আমাকে সুখ দিতে চাইলে চোখের জল মোছ নীতারে কেউ কারো জীবনে থাকে না। কাউকে না কাউকে যেতেই হয়। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। তুই আর আমি যে ক'দিন ছিলাম ভালোই ছিলাম।

রামদাসের ঐ কথায় সুখ ছিল না সই। ঐ কথায় কি আর চোখের জল ঠেকিয়ে রাখা যায়। রামদাসের বুকের ওপর মাথা রেখে সারারাত কেঁদেছি আমি। ও আর কোনো কথা বলেনি। অনুভব করেছিলাম রামদাসের বুকের ধুকধুকানি কেবল হ্রাসে

আস্তে কমে আসছে। সুবল দরজার কাছে মাদুর পেতে শুয়েছিল। আমি একলা মানুষটাকে আগলে বসেছিলাম। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। পুরো বর্ষায় অমন বৃষ্টি আর কোন দিন হয়নি। বাতাসে কুপি নিভে যায়। কি যে আঁধার ছিল সই। ভীষণ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল আমিও বুঝি মরে যাচ্ছি। শেষ রাতে রামদাস মারা যায়।

নীতা উদাস চোখে চুপ করে থাকে। ঘটির জলটুকু এক ঢোকে শেষ করে। বুড়ি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানিস সেদিন বাকি রাতটুকু আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ রামদাসের গানের মতো লাগছিল। রামদাসের গলা বড় মিষ্টি ছিল সই। আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। সুবল একবার বাঁকা করে তাকিয়ে বলেছিল, রামদাসকে কি ধুয়ে ফেলছো বৃষ্টির জলে? আমি ওর কথার উত্তর দেইনি। ঐ কথার কি উত্তর দেয়া যায়। তুই বল সই? পরদিন সকালে বৃষ্টি থামলে আমরা দু'জনে রামদাসকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম সোমেশ্বরীর বুকে। তারপর ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ি তখন সুবল দোতরা বাজাচ্ছিল।

বললাম, সুবল এখানে তুমিই থাকো। আমি আর কোনদিন ফিরবো না।

— সে আমি জানি।

সুবল মুখ না তুলেই বলেছিল।

— তুমি অনেক বেশি বোঝ সুবল।

সুবল আমার কথার জবাব দেয়নি। ফিরেও তাকায়নি। কেন যে ও আমাকে পছন্দ করতো না বুঝতাম না। ওর কাছে থেকে সাড়া না পেয়ে আমি আর দাঁড়াইনি। কোন দিন সোমেশ্বরীর ধারে ফিরেও যাইনি।

পথই হলো আমার ঘর। বহুদিন বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি সই কিন্তু সুখ পাইনি। কত আখড়ায় গেলাম। কিন্তু শান্তি কৈ? কেউ কেউ আছে সই পথের ধুলোর মতো। না চাইলেও পায়ে এসে জড়ায়। কেউ আকাশের মেঘ। হাপিত্যেশ করলেও বৃষ্টি হয়ে নামে না। এ করেই তো পথ চলি, মন না চাইলেও চলতে হয়।

নীতা গান ধরে—

সুজন মন আমার

খুঁজে দেখ তুই

তোর মনের মানুষ কই?

নীতা গান গায়, অনেকটা গুনগুনিয়ে। দোতরার শব্দ নেই।

বুড়ি চুপচাপ বসে থাকে। গান শোনার চেষ্টা করে। নীতার সঙ্গে কথা বললেই ওর মন অস্থির হয়ে ওঠে। নীতা বুড়ির জীবনে এক নিষিদ্ধ বাহকের মতো। নিষিদ্ধ জগতের খবর বয়ে নিয়ে আসে। যে খবরে ওর কোনো অধিকার নেই। বুড়ির হঠাৎ মনে হয় ওর মনের মানুষ নেই। গফুর ওর মনের মানুষ হতে পারেনি। ওদের জীবনে কেবল অনুষ্ঠান সত্য। অনুষ্ঠানের জের টেনে একটা মেকি লৌকিকতা বজায় রাখতে হয়। সমাজের নামে, ধর্মের নামে। আর এজন্যেই নীতা যা পারে বুড়ি তা পারে না। নীতার জীবন দক্ষিণা বাতাস। যেদিক খুশি সেদিক বয়। আর বুড়ি? বুড়ি বদ্ধ ঘরের গুমোট গরমে তালপাতার ক্ষীণ বাতাস। কোন দিকেই নড়তে পারে না। ইচ্ছে মতো ছোটাও যায় না

বিয়ে নামক অনুষ্ঠান আর গফুর নামক স্বামী দুটোই এখন বুড়ির জীবনের একমাত্র সত্য। এ গণ্ডির বাইরে বুড়ির আর কিছু করার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ নীতা গান থামিয়ে বুড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকায়।

– তুই যেন কি ভাবছিস সই? তোর কি হয়েছে রে?

নীতা দরদ দিয়ে বুড়ির সঙ্গে কথা বলে।

– আমি যদি তোর মতো হতে পারতাম।

– যা এ জীবন আবার কেউ চায় না কি, তোর কত সুখ! তুই কেনো আমার মতো ভবঘুরে হতে যাবি! তোর মতো জীবন পেলে আমি আর কিছু চাইতাম না রে? এমন গোছানো সংসার, স্বামী, ছেলে–

– ছেলে? বুড়ির কণ্ঠ যেন চিরে যায়।

নীতা একটু বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা ও জানে। বুড়ি কষ্ট পাবে এটা ও ভাবেনি। বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। নীতা ওকে খুশি করার জন্যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আসছে পৌষ মেলায় তোকে আমি শ্রীনাইল ধামে নিয়ে যাব সই। কেশা বাবার নামে মানত করলে নির্ঘাৎ তোর ছেলে হবে। কেশা বাবা সিদ্ধপুরুষ। কত লোক যে ওখানে যায় না দেখলে তোর বিশ্বাস হবে না। ওখানে গেলে পরাণটা একদম শীতল হয়ে যায় রে সই।

নমিতার মতো ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ করে নীতার কণ্ঠ। একই বিশ্বাসের আবর্তে নীতাও দোলায়িত। বুড়ির মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, ইচ্ছে করে এখনই ছুটে যেতে। নমিতার ক্ষীণ সূত্র নীতা আরো পাকাপোক্ত করে দিল। বুড়ির মন হালকা হয়ে যায়। এখন এই দুর্বল সময়ে ওর মন সবসময় একটা অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়। কেউ কিছু বললে সেটা অনবরত শক্তির ঝরণা বইতে থাকে। মনের গুমোট কেটে যায়। বুড়ির কষ্ট আর ঘুণপোকা হয়ে হৃৎপিণ্ড কেটে ঝাঁঝরা করে না।

– তুই হাত-মুখ ধুয়ে নে সই, আমি খাবার ব্যবস্থা করি।

নামিয়ে রাখা তরকারির হাঁড়িটা আবার চুলোয় চাপায় বুড়ি। তড়িঘড়ি করে রান্না শেষ করে। কলাপাতা কেটে এনে নীতাকে ভাত খেতে দেয়। নীতা বাসনে খায় না। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত, সেই সঙ্গে ডিমাই শাকের ভাজি। অপূর্ব লাগে নীতার। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় বলে খাওয়াটা সব সময় ঠিক হয় না। তাছাড়া ভিক্ষের চালে কি ভাত হয়? হয়তো জাউ। নীতা মনে মনে হাসে। খাওয়ার জন্যে ওর লোভ নেই। কতোদিন ভাত না খেয়ে কাটিয়ে দেয় তার কি হিসেব আছে! তবে বুড়ি ওকে খুব যত্ন করে খাওয়ায়। কখনো না খেয়ে যেতে দেয় না। তার বুড়ির হাতের রান্নার জন্যে নীতার জিভে জল গড়ায়। কি যে ভালো লাগে! খেয়েদেয়ে পান মুখে দিয়ে নীতা দোতারা আর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

– আসি রে সই?

– কোথায় যাবি এখন?

নীতা হেসে উত্তর দেয়, মনের মানুষের খোঁজে। যতদিন না পাই ততদিন খোঁজারও শেষ নেই। পথে পথে ভিক্ষে করি আর গান গাই। মনের মানুষ না হলে চলে না রে। একলা পথ চলা বড় কষ্ট। পথের কষ্ট তোকে বুঝাতে হয় না বুড়ি।

নীতা মন খুলে হাসে। চলতে চলতে গান ধরে—

বন্ধু আমার নির্ধনিয়ার ধন।

তারে দেখিলে জুড়ায় জীবন যৌবন।

না দেখিলে মরণ রে—।

নীতা ধুলো-ওড়া পথ দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তার ফেলে যাওয়া কথাগুলো সারাদিন বুড়িকে ব্যস্ত করে রাখে। পুকুরে গোসল করতে নেমে থমকে থাকে বুড়ি, তেঁতুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে গিয়ে থমকে যায় বুড়ির হাত। চুলোর তরকারি নাড়তে গিয়ে চুপ হয়ে যায় বুড়ি। বারান্দায় বসে বসে আবোল-তাবোল ভাবে। দেহে অবসাদ, ক্লান্তি জড়িয়ে ধরে। প্রতিটি স্নায়ু প্রার্থিত উত্তেজনার অভাবে ঝিমিয়ে যেতে চায়। কি যে জ্বালা! গফুর হাটে গেছে। ফিরবে সন্ধ্যায়। সলীম কলীম ভাত খেয়ে কোথায় খেলতে চলে গেছে। বুড়ির কিছু ভালো লাগে না। খাওয়া-দাওয়ার পর নকসীকাঁথা বিছিয়ে সেলাই করতে বসে। নকসিকাঁথার রঙিন সুতো বুড়ির হৃদয়ের পরতে নকসা বুনে চলে। কত উজ্জ্বল সুখস্বপ্ন বুড়িকে মাতিয়ে রাখে।

তখুনি সলীম কলীম ছুটতে ছুটতে আসে।

— মা, মা? মা জানো সখিনা'বু না কোথা থেকে একটা ছোট ছেলে এনেছে। এই এতটুকু?

কলীম হাত দিয়ে দেখায়। ও ছোট বলে ওর উত্তেজনা একটু বেশি। সলীম একটু ধীরস্থির।

কলীম বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরে।

— মা তুমি আমাদের জন্য একটা বোন আন না?

— আনবো, আনবো। এখন ছাড়।

— জানো মা ছেলেটা না কেমন করে কাঁদছিল। ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া......

কলীম অনুকরণ করে দেখায়। ওদের কাণ্ড দেখে বুড়ি না হেসে পারে না।

— আমাদের জন্যে কবে বোন আনবে মা? সত্যি করে বল?

— দেখি কবে আনা যায়। বললেই কি আর হুট করে আনা যাবে? দিনক্ষণ ঠিক করে শুভদিন দেখে তবে আনতে হয়। বুঝলি বোকা ছেলে?

বুড়ি কলীমের থুতনি নেড়ে আদর করে।

— সত্যি আনবে তো? তিন সত্যি কর?

— এই করলাম। সব এখন খেলগে যা।

কলীমের আবদার সবচেয়ে বেশি। যখন তখন বুড়িকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। সলীম ঠাণ্ডা। অতোটা আদর আবদারের মধ্যে নেই। ওরা যেমনি ছুটতে ছুটতে এসেছিলো তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে যায়। ওরা হাঁটে না। এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে যেন। কেবলই লাফায়। ছোটা ছাড়া কথা নেই। বুড়ির মনে হয় ছোটবেলায় ও নিজেও অমনি ছুটতো। ছুটতে না পারলে ভালো লাগতো না। ছি-বুড়ি খেলায় কেউ পারতো না ওর সঙ্গে। বাঁই বাঁই করে যে ছুটতো ডানে বামে তাকাতো না। কতদিন গাছ-গাছালির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যে ব্যথা পেয়েছে, কখনো হাত-পা কেটে গেছে। কোন দিন সেগুলো আমলই দেয়নি। কেটে গেলে শিয়ালমুখা দাঁতের তলে চিবিয়ে লাগিয়ে

দিত। রক্ত বন্ধ হয়ে যেত। জলিল বলত, তুই বড় শক্ত মেয়ে বুড়ি। কেমন করে যে সইতে প্যারিস? আমার কাটলে কেঁদেকেটে হুলস্থূল বাধাতাম। মাগো কাটাকুটি আমি সইতে পারি না।

বুড়ি হেসে গড়িয়ে পড়ত, তোর ছেলে হওয়াটাই ভুল হয়েছে জলিল। তুই তাহলে বুড়ি হয়ে যা, আমি জলিল হই।

— কি যে আজগুবী কথা। জলিল হলে তুই কি করবি?

— বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। আর কোন দিন ফিরতাম না।

— আমিও তাই করব।

জলিল উদাস হয়ে বলেছিল।

— তুই পারবি কচুকলা।

— দেখিস পারব। তবে তোর মতো অত তেজ আমার নাই বুড়ি। তুই যেন কেমন।

বুড়ি ভেবে দেখলো এখন আর সেই তেজ নেই ওর। ও এখন পালাতে চায় না, চায় বন্ধন। চায় মাতৃত্বের গৌরব এবং অহংকার। সলীম কলীম চলে যেতেই বুড়ির মনের সুতো ছিঁড়ে যায়। গত বছর বিয়ে হয়েছে সখিনার। বছর না ঘুরতেই ছেলে হলো। বুড়ি কাঁথা গুটিয়ে উঠে পড়ে। সমস্ত দুপুরটা ওর শূন্য জীবনের ওপর হাঁসফাঁস করছে যেন। ও উঠোনে নেমে দাঁড়ায়। কোথায় একটা ঘুঘু একটানা ডেকে যাচ্ছে। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক বুড়ির বুকের ভেতর কটকট শব্দ করে।

রাতের অন্ধকারে গফুরের কাছে কথাটা বলতেই গফুর হেসে চুপ করে যায়। বুড়ির বেদনাকে ও সবসময় সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেছে। কখনো রাগ করে, বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে অথবা পাড়াপড়শীর মতো বুড়ির বন্ধ্যাত্বকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বিরক্তি প্রকাশ করেনি। ওর আকাঙ্ক্ষাকে একান্ত স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। সন্তান কামনা গফুরের মধ্যে থাকলেও সেটা তত প্রবল নয়। দুটো ছেলে তার রয়েছে। বুড়ির না হলেই বা কি? বরং এই ভালো। বুড়ির এই সপ্রতিভতা গফুরকে ভয়ানক আনন্দ দেয়। ছেলে হলেই তো বুড়িকে আর এখনকার মতো এমন করে কাছে পাওয়া যাবে না। আজও গফুর বুড়ির কথার কোন উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। ঘুমুবার চেষ্টা করে। ওর ধারণা সন্তান যদি হয় এমনিতে হবে। ঐসব মানত-টানতে কিছু হবে না। গফুরের নির্বিকার আচরণে ওর মনটা যেন কেমন করে। ঘুম আসে না।

গফুরের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়। ডাকে।

— কিছু বলছ না যে?

— ঝাড়ফুঁক, তাবিজতুমার, গাছগাছালির ওষুধ সবই তো হলো আর কত করবি বুড়ি?

— এইবার শেষ। আর কখনো তোমাকে বলব না।

বুড়ির কণ্ঠ করুণ শোনায়। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকু আঁকড়ে ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

— তুই কিছু জানিস না বুড়ি। শ্রীনাইল যেতে পাক্কা ছয় মাইলের পথ। তিন মাইল হেঁটে, তিন মাইল গরুর গাড়িতে। বড় কষ্ট। পারবি না যেতে।

— খুব পারবে। তুমি দেখে নিও। ওগো! তুমি না কর না। বুড়ির কণ্ঠ মিনতিতে ভেঙে পড়ে। সেই কণ্ঠস্বরে এমন একটা সমর্পিত আবেদন ছিল যে গফুর আর না করতে পারেনি।

— আচ্ছা ঠিক আছে। সময় হলে নিয়ে যাব। তাও যদি তোর মনের সাধ মিটে। গফুরের বুকে মুখ গুঁজে গুটিগুটি শুয়ে পড়ে বুড়ি। খুশি খুশি লাগছে। আজ রাতে গফুরের ইচ্ছের কাছে নিজেকে একদম নিবেদন করে দেয়। একটা কথাও বলে না। একটা আপত্তি না। পলকে অনুভব করে ওর নিজের ভেতরেও কেমন একটা ইচ্ছে সমস্ত রক্তে চলাচল করে। রাতের অন্ধকারের মতো সব আকাঙ্ক্ষাও গাঢ় হয়ে ওঠে। বাইরে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকে। হয়তো আকাশে চাঁদও আছে। বাঁশবন সরসর করে। ভোররাতে দু'জনে ডিঙি নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে। আজকের উদ্দেশ্য আর মাছ ধরা নয়। খালের বুকে নিজের খুশি ছড়িয়ে দেবার বাসনায় বুড়ির তাগিদ ছিলো বেশি। আর গফুরতো উন্মুখ হয়ে থাকে। এমনি করে বুড়ির খেয়ালের স্রোতে ডুবে যাওয়ায় কি যে আনন্দ! কাদার গায়ে খালের জল ছলাৎ ছলাৎ করে। পাড়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে কাশবন। লম্বা লম্বা ঘাসের মাথা দেখা যায় পানির তলে। কেমন কাল দেখায় পানি। সে পানিতে নিজের ছায়া দেখতে পায় না বুড়ি। দেখার চেষ্টাও করে না! এখন আর অন্য কিছুতে মন নেই ওর। পাটাতনের ওপর শান্ত হয়ে বসে থাকে। মনে মনে ভাবে, গফুরের এখন শালুক কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছে। গফুর যে কি! শালুক পেলে মাছের কথা বেমালুম ভুলে যায়। নৌকায় এলেই ও বেশি ছুঁকছুঁক করে। গফুর বলে ঘরের চাইতে নৌকায় পেতে সুখ লাগে। ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে বুড়ি হাসে। ডিঙি তরতরিয়ে চলে। গফুর নিশ্চয় কোন নিরাপদ জায়গা খোঁজে। যেখানে নিবিড় আচ্ছাদন প্রাকৃতিক উষ্ণতা দেয়। গফুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ি ওকে বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। এখন ওর জলিলের কথা মনে হয়। জলিল ওর স্মৃতিপট দখল করে নেয়। ও কিছুতেই জলিলকে তাড়াতে পারে না। বুড়ির বিয়ে হবার পরই পালিয়ে শহরে চলে যায়। রিকশা চালায়। শহরে নাকি ও বেশ ভালোই আছে! জলিল গাঁয়ে এলে ওর কাছে শহরের অনেক গল্প শোনে বুড়ি। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়।

জলিল একদিন চুপি চুপি বলেছিল, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তোকে আমি শহরে নিয়ে যেতাম বুড়ি। বুড়ি ওর কথায় রাগ করতে গিয়েও পারেনি। আসলে এটাই হওয়া উচিত ছিল। জলিল পালিয়ে যাবার পর কত জায়গা ঘুরেছে, কত কাজ করেছে। চায়ের দোকান, মানুষের বাসা, হোটেল, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদি অনেক জায়গার পর ও এখন রিকসা চালায়। বুড়ির বুক কেমন করে। আচ্ছা জলিল কি ওর মনের মানুষ হতে পারতো? এটা কখনও ভেবে দেখেনি ও। অনবরত জলিল ওর হৃদয়ে লেপ্টে যায়। আস্তে আস্তে জলিল ওর শরীরে প্রসারিত হতে থাকে। বুড়ি শক্ত করে নৌকা চেপে ধরে। দাঁত কিড়মিড় করে।

— তোর কি হয়েছে বুড়ি? কি ভাবছিস যেন?

— জলিলের কথা ভাবছি?

— জলিল? গফুর ভুরু কুঁচকে তাকায়।

– জলিলের কথা ভাবছিস কেন?

– এমনি। মনে এলো তাই।

বুড়ি খাল-খন্দ ছাড়িয়ে উঠে পড়ে। চরাচরের অন্ধকার ঘিরে হয়ে আসছে। গফুরের হাতের বিড়ি থেমে যায়। সেই পরিচিত তেঁতুল গাছটার কাছে এসেছে ওরা।

– কি, ভয় পেলে নাকি?

– কত ধরনের রসিকতা যে তুই জানিস বুড়ি?

গফুর হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে। ডিঙি বাঁধার জন্যে লাফ দিয়ে নামে। বুড়ি মনে মনে ভাবে গফুরের কাছে ওটা রসিকতা হয়েই থাকে। ও আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়।

পৌষ মেলার দু'দিন আগে নীতা এসে হাজির। সঙ্গে তার সঙ্গী চরণদাস। বেটেখাটো ফর্সা, মোটা মানুষটি। মুখে হাসি লেগেই থাকে। গানের গলা ভাল না। ফ্যাসফ্যাসে করে কণ্ঠ। দোতরার টুংটাং শব্দে বুড়ি ঘর থেকে ছুটে আসে। ধানের মাড়াই হচ্ছে উঠোনে। পা ফেলার জায়গা নেই। বুড়ি চরণদাসকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। নীতা হাসে।

– অমন করে দেখছিস কি সই? মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছি রে

– ওমা, তাই নাকি।

বুড়ি ফিক করে হেসে ফেলে। ধান মাড়াইয়ের পাশ দিয়ে ওদের ডেকে এনে বারান্দায় বসায়। কামলাগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নীতা পোঁটলা-পুঁটলি নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। ধূলি-ধূসরিত পা। রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে। গায়ে-পিঠে ঠিকমত কাপড় নেই। সব এলোমেলো। জোরে একটা শ্বাস টেনে বলে, কাঁচা ধানের গন্ধে মন ভরে গেলো সই। তোর মতো সারা বছর এমন ধানের মধ্যে থাকতে পারলে জীবনে আর কিছু চাইতাম না।

– তোকে কি কারো ধরে রাখার সাধ্যি আছে সই। পথে পথে না ঘুরলে তোর জনমই বৃথা।

নীতা মুখ নিচু করে হাসে।

– জল দে সই।

বুড়ি পানি আনতে যায়। চরণদাস দোতরা বাজায়।

– তোমার সই মন্দ না।

– মনে ধরেছে বুঝি?

– মনে ধরলেই বা কি এসে যায়?

চরণদাস মুখ টিপে হাসে। বুড়ি ঘটি-ভরা পানি নিয়ে আসে। নীতা অর্ধেকটা খেয়ে চরণদাসকে দেয়। চরণদাস এক চুমুকে বাকিটা শেষ করে। বুড়ি হাঁ করে থাকে।

– ভাগাভাগি কেন? আর দেব?

– আমরা অমন করেই খাই। নইলে পেট ভরে না।

নীতাকে আজ একদম অন্যরকম লাগে। এই নীতাকে বুড়ি যেন চেনে না। বুড়ির সঙ্গে ওর অনেক তফাৎ।

– যাবি না সই পৌষ মেলায়? তোকে নিতে এলাম?

— যাব সই যাব। সলীমের বাপ গরুর গাড়ি ঠিক করতে গেছে।

বুড়ির চোখে-মুখে খুশির রেণু ছড়িয়ে যায়।

— ও তুই গরুর গাড়িতে যাবি? আমার চরণ দু'খানাই ভরসা। সঙ্গে আমার চরণদাসও রয়েছে।

চরণদাসের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে নীতা। চরণদাস চোখ টিপি দেয় তারপর আবার দোতারার ওপর ঝুঁকে পড়ে। বুড়ি ওদের ভাবসাব দেখে অবাক হয়। ভালও লাগে। মনে হয় গফুর না হয়ে জলিল হলে হয়ত ওর জীবনটা এমনই হতো। কামলারা হেই হেই করে গরু তাড়াচ্ছে। ধান মাড়াই হচ্ছে। এ সময়টা ভীষণ ব্যস্ত থাকে বুড়ি। ছবিগুলো ওর মনের মধ্যে ওলোট পালোট খায়।

আমরা উঠি-রে সই। এখুনি রওনা করা দরকার। নইলে আবার ঠিকমত পৌঁছতে পারব না। জানিস তো পথে পথে কত জায়গায় বসতে হয়।

বুড়ি ঘরে গিয়ে ডালা ভর্তি মুড়ি আর গুড় নিয়ে আসে।

— তোর তাড়া আছে। আমার তো রান্না হয়নি সই। এখন এই খা।

— খাও ঠাকুর। সই আমাদের পেসাদ দিয়েছে।

নীতা এক মুঠি মুড়ি গালে পুরে।

সই আমাদের যা দেয় তাতেই মন ভরে যায়। চরণদাস মুখ তোলে না। লম্বা বাবরি ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে থাকে। টুংটাং করে দোতরা বাজায়। যেন চরণদাসের অন্য কোন দিকে মন নেই। বুড়ি চরণদাসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

— কি গো ঠাকুর তুমি যে আমার সইয়ের দিকে মুখ তুলেই চাইছ না?

— তোমার ঠাকুর রসের নাগর নয়? বুড়ি খিলখিলিয়ে হাসে।

— দিল তো সই তোমাকে ঠুকে? নীতা চরণদাসের হাঁটুতে চাপ দেয়।

চরণদাস কপালের উপর এসে পড়া চুল হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে বড় বড় চোখে বুড়ির দিকে তাকায়। সে দৃষ্টিতে বুড়ি হকচকিয়ে যায়। কিছুটা বিব্রত বোধ করে। চরণদাসও চোখে চোখ রেখে বলে, সে কি আর যেখানে সেখানে পড়ে সই? জায়গামত না পড়লে যে রস শুকিয়ে যায়।

— ওমা তাই নাকি? তোর মনের মানুষ চুপচাপ থাকলে কি হবে সই কথার তীর তৈরি করে রাখে। জায়গা মত ছুড়ে মেরে একদম ঘায়েল করে দেয়।

চরণদাস কিছু বলার আগে বুড়ি রণেভঙ্গ দিয়ে পালায়। ওরা দু'জনে হাসতে থাকে।

নীতা ফিসফিসিয়ে বলে, যেখানে রস ফেলেছো সেটা জায়গামত হয়েছে তো?

— একদম। না হলে কি আর সঙ্গে নিয়ে পথে পথে ঘুরি।

চরণদাস একমুঠি মুড়ি গালে পুরে এবং মুড়ি খেতেই মহাযোগী হয়ে ওঠে। নীতা এক মনে মুড়ি চিবোয় আর ধান মাড়াই দেখে। এ দৃশ্যের সঙ্গে ওর জীবনের কোন যোগ নেই। কেবল ভিক্ষে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গোলা ভরা ধান কি নীতা জানে না। পরক্ষণে ও হেসে ওঠে। এ বন্ধন ও চায় না। এর চেয়ে পথে পথে ঘোরাতেই আনন্দ বেশি। সব কাজ কি আর সবার সাজে? চরণদাস অবাক হয়, হাসছিস যে?

— এমনি।

– বল না কি?

– ভাবলাম বুড়ির মতো সংসার আমি করতে পারব না।

– আর বুড়িও তোর মতো পথে পথে ঘুরতে পারবে না।

– ঠিক। দু'জনেই হারে।

– এই যে সই এবার তাহলে উঠতে হয়।

– যা-বি? আবার কবে আসবি? বুড়ির কণ্ঠে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে

– মেলায় তো তোর সঙ্গে দেখা হবে।

– হবে তো?

– হ্যাঁ-রে হবে। আমি তোকে খুঁজে নেব। তুই কিচ্ছু ভাবিস না। এবার তোর মনের সাধ পুরবে সই। তুই দেখিস আমার কথা ফলে কি না?

– তাই যেন হয়।

বুড়ি মনে মনে বলে। ওরা ঝোলাঝুলি কাঁধে বেরিয়ে যায়। ওদের অপসৃয়মাণ দেহ পথের বাঁকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বুড়ি। এই ধান মাড়াই, গরু, কাজের লোক, সজনে গাছ বুড়ি ভুলে যায়। পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে এই পরিচিত সব কিছু কেমন বিস্বাদ হয়ে যায়। জঘন্য, নোনাধরা এই ঘর-সংসার। বুক ভেঙে যায়। চোখ ফেটে জল আসে। ঘরে ফিরে কাঁথায় মুখ গুঁজে প্রাণ খুলে কাঁদে বুড়ি।

পরদিন বুড়িকে নিয়ে রওনা হয় গফুর। পথের কষ্ট বুড়ির কাছে কোন কষ্ট বলেই মনে হয় না। গফুরের মনে হয় ওর ভেতর এখন একটা দৈবশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সব কষ্ট উপেক্ষা করার জীয়নকাঠি পেয়েছে। গরুর গাড়ির দুলুনির সঙ্গে ভাবনা মিলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে বুড়ি। পথের দিকে দু'চোখ মেলে রাখে। হলদী গাঁ-র বাইরে এই প্রথম ওর যাত্রা। গাঁ-র বাইরে গাঁ আছে। মাঠের বাইরে মাঠ। সেই মাঠের উপর দিয়ে দৃষ্টি চালালে কোথাও আটকায় না। পথের বাঁকে নতুন পথ বেরিয়ে যায়। সে পথ কত নাম না জানা দিকে চলে গেছে। ও কেবল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। গাঁর বাইরে গাঁয়ের রূপ বদলে যায়। পরিচিত গাছ গাছালি, একই ধরনের ঘর-বাড়ি তবুও বুড়ির মনে হয় সব গাছের রঙ আলাদা, সব ঘরের আদল আলাদা। কোন কিছু চিনতে পারছে না ও। বুড়ি বুক ভরে এই অচেনা জায়গায় শ্বাস নেয়। গন্ধেও পরিচিত হলদী গাঁ-টা কোথাও আর খুঁজে পাচ্ছে না ও। বুক ভরে যায়। ও একটা নতুন জায়গায় আসতে পেরেছে। এই আনন্দকে সম্বল করে ও কৈশোরে ফিরে যায়। অদূরেই শ্রীনাইল ধাম এগিয়ে আসে।

গরুর গাড়ির রাস্তা একসময় শেষ হয়। মাঠের আল ধরে পায়ে হাঁটা পথ। ক্লান্তি নেই বুড়ির। ধান কাটা হয়ে গেছে। নেড়া মাঠ ধু-ধু করে। হাঁটতে ভাল লাগে ওর। ছোটবেলায় এমনি মাঠে মাঠে কত ঘুরে বেড়িয়েছে। নাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে ছোট হাঁড়িতে রস জাল দিয়েছে। মিষ্টি আলু পুড়িয়ে খেয়েছে। শৈশব আর কৈশোর বুড়ির জীবনের লুকানো গুহার মণি-মাণিক্য। মাঝে মাঝে সে গুহার দরজা খুলে সেই চাকচিক্য নাড়াচাড়া করে। স্বপ্নের ঘোরে পথ হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খায় বুড়ি। পেছন থেকে ধরে ফেলে গফুর।

— একটু দেখে শুনে হাঁটিতে হয় তো? ভীষণ লজ্জা পায় ও।

— কেমন করে যে হয়ে গেলো।

বুড়ি একমনে মানুষের পথচলা দেখে এগিয়ে চলে। যতই শ্রীনাইল ধাম এগিয়ে আসে ততই মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাল কাল মাথা অগণিত হয়ে ওঠে। দূরে মেলার ঘরের চালা দেখা যায়। একটা মৃদু গুঞ্জনও ভেসে আসে। ধান ক্ষেতের আল ছাড়িয়ে বুড়ি সমতলে এসে ওঠে। খালি পা ধূলিধূসরিত হয়ে যায়। গফুর ওকে পেছন থেকে ডাক দেয়, আস্তে চল বুড়ি।

বুড়ি আবার লজ্জা পায়। চলার গতি কমিয়ে দেয়। বুড়ো নিমের চিরল পাতায় ওর স্বপ্ন-রঙিন মনের পট আঁকা হয়ে যায়। ও আবেগে কাপড়ের পুঁটলিটা বুকের কাছে চেপে ধরে।

ধামে গিয়ে ভক্তিভরে বাবার নামে মানত করে নিমগাছে পুঁটলি বাঁধে। ধুলো মাখে সারা শরীরে। তবে অন্যসব নারী-পুরুষের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দেয় না। ভীষণ সংকোচ লাগে ওর। কিছুতেই নিজের সঙ্গে পেরে ওঠে না। নিজের মনকে কয়েকবার শাসন করে। মনে মনে বলে, বিশ্বাসে ফুটো রাখতে নেই। তবুও হয় না। নিঃশব্দে ধুলো মেখে উঠে আসে। গফুরকে বলে, আমি যে গড়াগড়ি করলাম না ফল পাবো তো?

গফুর হেসে ওর আশংকা উড়িয়ে দেয়।

ওতে কিছু হয় না। বিশ্বাসটাই আসল। তুই যেমন কেশা বাবাকে ধ্যানজ্ঞান করেছিস ওতেই হবে।

গফুরের কথায় বুড়ি আশ্বস্ত হয়। গফুর এখানে এসে মাতামাতি করেনি। কোন কথাও বলেনি। বুড়ির বিশ্বাস ভক্তিকে উপেক্ষা করে অবহেলায় উড়িয়ে দিতে পারেনি। যদিও নিজের মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি প্রবল হয়ে উঠলে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায় ও। গফুর মনে মনে বুড়ির জন্যে আপস করে।

কেশাবাবার ধামে মানত করার পর হালকা হয়ে যায় বুড়ির মন। গফুরের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখে। মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, কাগজের পাখি, রকমারি খাবার আরো কত কি নিয়ে বসে আছে! সলীম কলীমের জন্যে কাঠের ঘোড়া আর হাতি কেনে। মাটির পাখিও নেয়। কলীমের বায়না ছিল বাঁশি। বুড়ি কেনে হাত-ভর্তি কাঁচের চুড়ি, নাকের নোলক, কানফুল। খুশির অন্ত নেই ওর। গফুরের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি নেবে?

— আমি? আমি আর কি নেব?

— তুমি একটা গামছা নাও আর একটা খলুই।

— খলুই? খলুই দিয়ে কি হবে? তুইতো আর মাছ ধরতে যাস না?

— এই জন্যেই তো নেবে। আমি গেলে তো আর মাছ ধরা হয় না। শূন্য খলুই ঘরে ফেরে।

— তাই তো, ঠিক বলেছিস। তবু শূন্য খলুই আমার জন্যে ভালই ছিল বুড়ি।

বুড়ি গফুরের চোখে একপলক দৃষ্টি ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। গফুরের কণ্ঠে ওর মন ছুঁয়ে যায়। তারপর দু'জনে মিলে গামছা আর খলুই কেনে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে

বিরাট এক কড়ুই গাছের নিচে নীতা আর চরণদাস দলবল নিয়ে আসর জমিয়ে তুলেছে। বুড়ি থমকে দাঁড়ায়। কত আবেশভরে গান গাইছে নীতা। চোখ দুটো বোজা, টুংটাং দোতরা বাজায় চরণদাস। বুড়ির মনে হয় এ নীতা সইকে ও চেনে না। সেই পরিহাস প্রিয় চটুল নীতা এ নয়। ও এখন অন্য জগতের বাসিন্দা। এ জগৎ বুড়ির একদম অপরিচিত; এ জগতের মর্মও ও বোঝে না। হঠাৎ মনে হয় কেশাবাবার ধ্যানে নীতাকেই মানায়, বুড়ি এখানে বড্ড বেমানান। নীতার মত সব ভুলে ডুবে যাওয়া মন বুড়ি কোথায় পাবে? নীতার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। বলবে, সই তোর মত আমাকে করে নে; নইলে আমার মনের আশা বোধহয় পুরবে না।

গফুর ওর হাত ধরে টানে, চল। বেলা পড়ে যাবে।

বুড়ি মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে নীতা?

– ও এখন তোকে চিনবে না। দেখছিস না ধ্যানে রয়েছে।

– ধ্যান বুঝি? গান গাইছে তো?

– ওই একই কথা; ওদের গানই ধ্যান।

– তাই তো।

বুড়ি এতক্ষণে বুঝতে পারে। ঐ গানই নীতার একমাত্র অবলম্বন। অত লোকের মাঝ থেকে নীতাকে ডাকা সম্ভব হয় না। বুড়ি গফুরের সঙ্গে চলে আসে। দোতরার টুংটাং ধ্বনি ওর মনটাকে নরম করে রাখে। নীতার নির্লিপ্ত মুখটা ছবি হয়ে আটকে থাকে মনের পটে। মনে মনে বলে, নীতার বিশ্বাস, নমিতার বিশ্বাস আমার জীবনকে ভরিয়ে তুলুক।

সারাদিন মেলায় ঘোরাঘুরি করে বুড়ির মনে হয় একটা নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে। মুক্তছন্দ বিহঙ্গের মতো এমন করে কোন দিন বুড়ি নিজেকে একান্ত আপন করে পায়নি। বুড়ির নিজস্ব কতগুলো মুহূর্ত ছিল। এক একটা দিনতো ওর কাছে স্বপ্নের মতো। তাই মনে হয় আজকের এই দিনটি ওর একলার। শুধু ওর নিজের। আর কারো না। আর কোন লোকের নয়। পৌষমেলার শত শত নারী-পুরুষের অন্তরে বুড়ি কেবল নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। শুকনো ধুলো-ওড়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বাতাসের কনকনে স্পর্শ, মেলার হৈচৈ কোন কিছুই বুড়িকে ক্লান্ত করে না। ক্লান্ত হয় গফুর। ধুলোয় চোখ-মুখ ঝাঁঝাঁ করে। কাশতে কাশতে গলা চিরে যায়। তাছাড়া এত লোকের ঠেলাঠেলিতে ও আরো বিরক্ত হয়ে ওঠে। শীতের মিষ্টি আমেজময় রোদও আজ কেমন পানসে ঠেকে। মেজাজ তেতে উঠলে গফুরের শরীরের ভেতরটা রি রি করে। তবু বুড়ির অনাবিল আনন্দঘন উজ্জ্বল মুখাবয়ব গফুরকে বিমুগ্ধ করে। অনেকদিন পর বুড়ি যেন কৈশোরের লাবণ্য ফিরে পেয়েছে। আর সে কারণেই গফুর ওর মেজাজের ঘোড়াটার লাগাম টেনে রাখে। ভেবে অবাক হয় এমন তেজ বুড়ি কোথায় পেল? গফুর কেন জোর করেও এই তেজ ধরে রাখতে পারছে না? কেন বারবার মনের সুতো ছিঁড়ে যায়?

– ওগো তুমি কি ভাব?

– কিছু না রে বুড়ি। চল ফিরে যাই।

– এখনও তো বেলা পড়েনি। বুড়ির কণ্ঠে আপত্তি।

– ছোট দিনের বেলা। ফিরতে আঁধার নামবে।

– নামুক!

বুড়ি ঘাড় বাঁকা করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গফুর হেসে ফেলে।

– ঠিক আছে চল ভাত খাই।

রাস্তার পাশে বেড়ায় ঘেরা ছোট এক হোটেলে ঢুকে ভাত খায় দুজনে। তার পরই ঘুম পায় গফুরের। কিন্তু বুড়ির বায়না ম্যাজিক দেখবে। অগত্যা ম্যাজিকের জন্যে বসতে হয় গফুরকে। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে আসে শরীর। মাঝে মাঝে বুড়ির ছেলেমানুষী হাততালি ওকে সচকিত করে তোলে কেবল।

ফেরার পথে বুড়ির চোখে ঝিলমিল করে আলোর নাচন। আলের উপর দিয়ে হাঁটা-পথটুকু লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যায় বার বার পেছনে পড়ে যায় গফুর। এত ক্লান্ত ও বুঝি আর কোনদিন হয়নি। মাঠ পেরিয়ে গরুর গাড়িতে ওঠার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। গাড়ির ক্যাচর ক্যাচর শব্দের সঙ্গে শীতের রুক্ষ দিন বারে বার হতাশ করে দিচ্ছিল গফুরকে। বুকের ভেতর স্বপ্নের নীল পাখিটা আর গান গায় না। গফুরের মনে হয় কি যেন এখানে রেখে যাচ্ছে। শ্রীনাইল ধাম ওর সমস্ত সুখটুকু কেড়ে রেখে ওকে দেউলে করে দিয়েছে। এখন বুড়ির দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে ওর। যদি ব্যর্থ হয় দিন গোনার প্রহর? তাহলে সেই নিরুত্তাপ জীবনহীন বুড়িকে নিয়ে ঘর করবে কেমন করে ও? একটা আতঙ্ক বুকে তীরের মত বিঁধে থাকে। কোনক্রমেই তাকে আর টেনে বের করা যায় না। গফুর উদাসী দৃষ্টি মেলে রাখে রুক্ষ মাটি, শুকনো গাছ, হলদে পাতা, বিবর্ণ ঘাসের বুকে। গরুর গাড়ির প্রাণহীন পথ চলা বুড়ির আশাহীন ভবিষ্যতের মতো।

বুড়িকে বুঝতে পারে না গফুর। বুড়ির ভাসা ভাসা চোখ দুটো কল্পনার উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ। যেহেতু বুড়ি জাগতিক সব ব্যর্থতা ও শূন্যতাকে একপাশে রেখে সুখের খাঁচা বুনতে পারে সেহেতু ওর চোখের তারা সহজেই ভেসে ওঠে। ও এখন মরুভূমিতে স্বপ্নের ফুল ফুটিয়ে চলেছে। ক্লান্তিহীন সে উৎসবে গফুরের কোন আমন্ত্রণ নেই। গফুর এখন পথের ধারে একলা। বুড়ির উৎসবে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে– বুড়ির উল্লাসমুখর হৃদয়ে ময়ূর নৃত্যের মতো।

– ওগো তুমি কি খুশি হওনি? বুড়ি আচমকা প্রশ্ন করে।

– একথা কেন বুড়ি?

– তোমার চোখ-মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে?

– ও কিছু না!

গফুর হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে। বুড়িও আর প্রশ্ন করে না।

একটু পরেই গরুর গাড়ির দুলুনীতে ঘুমিয়ে পড়ে ও। গফুর বিচলিত মন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। শ্রীনাইল ধামের বুড়ো নিমগাছের ক্ষুদ্র বিশ্বাসের অঞ্জলি কি বুড়ির অনুর্বর জীবনকে ধন্য করতে পারবে? ছয় বছরের ব্যর্থ প্রহর গোনা কি শেষ হবে? নমিতার বিশ্বাস কি বুড়ির বিশ্বাসকেও মহীয়ান করবে?

ঘুমন্ত বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে গফুর কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তাকিয়ে দেখে জনস্রোত। এখনো যাওয়া-আসা চলছে। দু দিন ধরে মেলা হবে। সবার লক্ষ্য এক– পৌষমেলা উপলক্ষে শ্রীনাইল ধাম। সবার বিশ্বাস এক– বুড়ো নিমগাছে বাবার নামে সোয়া পাঁচ আনার পুঁটলি বাঁধলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যায়। কত দূর-

দূরান্ত থেকে লোক আসে। কত জনে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্যে। আশায় বুক বেঁধে রাখে। তাই ছুটছে সবাই। ছোটার শেষ নেই। আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ চাই। আকাঙ্ক্ষার পরিণতি চাই।

গফুর অনেক দূরের তাল গাছের মাথায় তাকিয়ে থাকে। ওর শরীর ভেঙে আসছে। ইদানীং কেমন চট করে ক্লান্ত হয়ে যায়। এই মুহূর্তে গফুরের বড় বেশি হুঁকো টানতে ইচ্ছে করে।

গাঁয়ে ফিরে বুড়ি বেশ একটা পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে দিন কাটায়। গফুর লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখে। দেখতে ভালো লাগে। ঘাসের বুকে রঙিন প্রজাপতির কথা গফুরের মনে হয়। সংসারটা বুড়ির উচ্ছ্বাসে একটা সবুজ মাঠ হয়ে গেছে। গফুরের অশুভ আকাঙ্ক্ষা মিথ্যে হয়েছে দেখে ও আশ্বস্ত। বুড়ির মধ্যে সে হতাশা এখন নেই। মন খারাপ করে মুখ কালো করে দিন কাটায় না। চুপে চুপে কাঁদে না। সবার কথা ভুলে গিয়ে পুকুরঘাটে বসে থাকে না। যখন তখন গফুরের কাছে এসে দাঁড়ায়। ছেলেমানুষী করে। গফুরের মনে হয় বুড়ি এখন বাতাসে আঁচল ওড়ায়। ওর পালে হাওয়া লেগেছে। ছুটে ছুটে কাজ করে। সলীম কলীমকে আদরে ভরে তোলে। কলীম একদিন অবাক হয়ে বলে, মা তুমি এত খুশি কেন?

অকস্মাৎ লজ্জা পায় বুড়ি।

– দূর পাগল খুশি কৈ রে?

– হ্যাঁ তুমি অনেক ভাল হয়ে গেছ। এখন আর আগের মত বক না।

– তোকে আমি কখনো বকি?

– আগে একটু একটু বকতে এখন তাও না। বল না মা তোমার কি হয়েছে।

বুড়ি উত্তর দিতে পারে না। বিব্রত বোধ করে। পাশ কাটাবার চেষ্টা করে।

– আমার বুড়ো বাপের মত প্রশ্ন শুরু করেছে। যা খেলগে যা।

– না বললে যাব না। কিছুতেই যাব না। কলীম জেদ করে।

– এখন খেলতে গেলে বিকেলে কিন্তু নাড়ু বানিয়ে দেব।

– সত্যি তো?

– হ্যাঁ সত্যি।

কলীম চলে যায়। গফুর মিটমিটিয়ে হাসে।

– তোমার হাসি দেখলে গা জ্বালা করে।

বুড়ির মুখ লাল হয়ে ওঠে। গফুর আরো জোরে জোরে হাসে। হাসতে হাসতে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে। শ্রীনাইল ধামে যাবার আগের দিনগুলোর বুড়ির জঘন্য বিষণ্ণতার নিচে গফুর তলিয়ে যাচ্ছিল যেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পর আবার মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। বুড়ি এখন আশ্চর্য সতেজ আর প্রফুল্ল। এমন কি কলীমের বেশি আবদারে মাঝে মাঝে রান্না ঘরের পাশে মারবেলও খেলে। পড়শিদের সঙ্গে এখন গভীর হৃদ্যতা। গফুরের মনে হয় বুড়ি কি নমিতার মতো এক গভীর বিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষাকে বুকে লালন করছে। এখন বুড়ির বুকের মধ্যে এক নিষ্ঠার স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

দিন গড়ায়। মাস গড়ায়। মাস আটেক কেটে যায়। বুড়ি তবু বিশ্বাস হারায় না। গফুর একদিন ঠাট্টা করে।

— তোর বাবাতো দয়া করছে না বুড়ি?

বুড়ি গফুরের মুখ চেপে ধরে।

— ছি বাবার নামে এমন করে বলে না। একদিনে কি আর সব হয়? জানো না সবুরে মেওয়া ফলে। ধৈর্য ধরলে ঠিক ফল পাব।

— হ্যাঁ ভাল। আস্থা রাখা ভাল।

গফুর মনে মনে আশ্বস্ত হয়। বুড়ির ছেলেমেয়ে হোক বা না হোক গফুরের কিছু আসে যায় না। কিন্তু বুড়িকে যে নতুন করে পাওয়া গেছে এটাই লাভ। এ উপরি পাওনার মূল্যও তো কম নয়। ও মনে মনে শ্রীনাইল ধামের কেশাবাবাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। বাবা তাকে দয়া করেছে ঠিকই।

এর মাঝে জলিল আসে শহর থেকে। ওর বিয়ে ঠিক করেছে ওর মা। বৌ খুব সুন্দরী। বৌ নিয়ে শহরে চলে যাবে। জলিলের বাবা নাই। মা-ই সব। আর মায়ের ও একই ছেলে। জলিলকে দেখেই বুড়ি বিষণ্ণ হয়ে যায়। জলিল কিছু বলার আগেই বলে, তোমার বিয়েতে আমি যাব না জলিল?

জলিল বিস্মিত হয়। ছোটবেলায় দু'জন দু'জনকে তুই বললেও এখন কেউ কাউকে তুই বলে না। বুড়ির মুখের দিকে চেয়ে জলিল কিছুই আঁচ করতে পারে না।

— তোমার কি হয়েছে বুড়ি?

— কিছু না।

— তবে আমার বিয়েতে কি দোষ হলো?

— কিছু না।

জলিল কি বলবে ভেবে পায় না। দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটায়। বুড়ি একমনে কুটুস-কুটুস সুপোরি কাটে। বুড়ির মতো এমন চিকন করে সুপোরি আর কেউ কাটতে পারে না। বিয়ে, উৎসবে ওর খাটুনি বেড়ে যায়। ডালা ডালা সুপোরি কাটতে কাটতে কোমর ব্যথা হয়।

— এত সুপোরি কি হবে?

— সকিনার ছেলের আকিকা হবে। ওরা কাটতে দিয়ে গেছে।

— শুনলাম শ্রীনাইল ধাম গিয়েছিলে?

— হ্যাঁ। কেশাবাবার ধামে মানত করে এলাম।

বুড়ির মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জলিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আসলে মানত করে কিছু হবে না। ডাক্তার দেখানো দরকার। গফুর ভাইকে বলো তোমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে।

— ডাক্তার? ডাক্তার কেনো? আমার তো কিছু হয়নি?

— সে সব মেলা কথা। আমিও অতো বুঝি না। আমার এক দোস্তকে দেখেছি ওর বউকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। ডাক্তার দেখেটেখে বলেছে ওদের কোন দিন ছেলেমেয়ে হবে না। ডাক্তাররা সব বুঝতে পারে।

জলিলের এমন আজগুবি কথা বুড়ি কিছু বুঝতে পারে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে। ওতো জানে কেবল অসুখ করলেই লোকে ডাক্তারের কাছে যায়।

— কি সব আজেবাজে কথা।

— আজেবাজে নয় বুড়ি। খাঁটি কথা।

— থাকগে আমি শুনতে চাই না।

বুড়ি রেগে যায়। সুপোরি কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলে।

— উঃ মাগো।

বুড়ি আঙুল চেপে ধরে উঠে যায়। ন্যাকড়া ছিঁড়ে আঙুল বাঁধে।

— দেখি বুড়ি কতোটা কেটেছে?

— না।

ও পুকুর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। জলিলের কোন কিছু করার থাকে না। বুড়ির আচরণে বিরক্ত হয়। এসেছিল বুড়ির সঙ্গে ওর বিয়ে নিয়ে কিছু হাসি-তামাসা করবে। বুড়ি খুশি হবে। জলিলের মনতো খুশিতে টইটম্বুর। সব আনন্দ এমন করে মাটি হলো দেখে ও আর দাঁড়ায় না। কিছু কেনাকাটার জন্যে বাজারের দিকে যায়।

ঘাটের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে বিরক্ত হয় বুড়িও। জলিল এলেই এমন এক একটা কথা বলে যাতে বুড়ির সমস্ত অনুভূতি ওলোটপালোট হয়ে যায়। সেই কথাগুলো বুড়ি তার পারিপার্শ্বিকের জীবনযাপনের সঙ্গে মেলাতে পারে না। তখন বুড়ির কষ্ট বাড়তে থাকে। বুকের ভেতর যন্ত্রণার স্রোত প্রবলবেগে গর্জন করে। ও নিঝুম হয়ে যায়। কথা বলতে ভাল লাগে না। কাজ করতে ভাল লাগে না। কারো সঙ্গ অসহ্য ঠেকে। বুড়ি আজও পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কলাগাছের আড়ে আড়ে প্রায় খালের কাছাকাছি যায়। ডৌয়া গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে খালের বুকে জোয়ার আসা দেখে। এই জোয়ার আসা দেখতে ওর ভীষণ আনন্দ। আস্তে আস্তে খালের বুক কেমন করে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্তি ভুলে যায়। ও আবার আগের ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারে। জলিলের আজেবাজে কথাগুলো জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দেয়।

ধুমধাম করে জলিলের বিয়ে হয়। দু'দিন পর ও বৌ নিয়ে শহরে চলে যায়। বুড়ির মন খারাপ হয়ে থাকে। কখনো চোখে জল এসে পড়ে। নিজেকে শাসন করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এর মধ্যে বুড়ির থুনথুনে বয়সী মা মারা যায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার দরুণ ওর মা-র মৃত্যু বাড়ির সকলের কাছে স্বস্তির কারণ হয়। সে মৃত্যু ওকেও তেমন ঘায়েল করে না। বরং মার কষ্টটাই ওর বেশি খারাপ লাগতো। তবু বুড়ি ডাক ছেড়ে কাঁদলো। ওর মনে হলো ওর জীবন থেকে একটা শীতল ছায়া সরে গেল। মা'র মৃত্যুর চাইতেও জলিলের বিয়ে বুড়ির মনে বড় বেশি দাগ কাটলো। বুড়ি কিছুতেই ভুলতে পারল না। যেন জীবনের সীমানা বদল হয়ে গেল। মানসিক আশ্রয়হীন হয়ে খোলা প্রান্তরে ঝাঁ ঝাঁ রোদের দুপুরে উদোম গায়ে ছিটকে পড়ল। বুড়ির সব অবলম্বন যেন নিঃশেষ।

যাবার আগে জলিল একদিন ঘাটলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমার বউ কেমন বুড়ি?

— চাঁদের মত। শহরে তো নিচ্ছ। ধরে রাখতে পারবে তো?

বুড়ি বাঁকা করে তাকিয়েছিল।

— এমন কথা কেন?

— এমনি বললাম।

বুড়ি হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল।

— তোমাকে কখনোই বুঝতে পারি না।

জলিল মুখ কালো করে চলে গিয়েছিল। শহরে যাবার দিন আর দেখা হয় নি। এখন ঘুরেফিরে সেকথা মনে হয়। বুড়ি বুঝতে পারে না এত জটিলতা ওকে আক্রান্ত করে রাখে কেন?

ওদের বিবাহিত জীবনের সাত বছর কেটে যাবার পর ঠিক আট বছরের মাথায় বুড়ি সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে। লক্ষণগুলো সব একে একে যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও ততই অস্থির হয়। যেদিন বুঝলো যে হ্যাঁ সত্যিই ওর ভেতরে পরিবর্তন এসেছে সেদিন দৌড়ে গফুরের কাছে আসে। গফুর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিল। বুড়ি এক টানে কাঁথা সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে।

— কি হয়েছে তোর বুড়ি?

— দাঁড়াও বলছি।

বুড়ি পাগলের মত গফুরের বুকে মুখ ঘষে। বুড়ির এমন বেহিসাবি উচ্ছ্বাস গফুর আর কোনদিন দেখেনি। কখনো এমন করে এত কাছে এসে ও ধরা দেয়নি। ওর যে কখন কি হয় বোঝা মুশকিল। আজ আবার কি হলো? অনেকটা সময় বুড়িকে শান্ত হতে দিয়ে গফুর আস্তে আস্তে ওর মুখ তুলে ধরে।

— কি হয়েছে বলবি তো? কিছু না বললে বুঝবো কি করে যে তোর সুখ না দুঃখ?

— ওগো বাবা দয়া করেছে।

— সত্যি?

— হ্যাঁ, আমি ঠিকই বুঝতে পারছি।

বুড়ি উত্তেজনায় হাঁফায়। এবার গফুরের পালা। খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ও নিজেও। হঠাৎ মনে হয় খুশিটা শুধু বুড়ির একলার নয়। ওর নিজের ভেতরেও যে এত আনন্দ ছিল খবরটা না শোনা পর্যন্ত ও টের পায়নি। লজ্জায়, আনন্দে উদ্ভাসিত বুড়ির মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে গফুর। খুব সহজে সন্তান পেয়েছিল বলে সলীমের মা এমন করে খুশি হয়নি। আর দশটা সহজ পাওয়া বস্তুর মত ছিল সাদামাটা। বাচ্চা পেটে এসে গেছে চার মাস পর্যন্ত এটা সে নিজেও টের পায়নি। খবরটা জানার পর গফুর ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল।

— ধুত্ কি যে ঝামেলা?

— সলীমের মা মিনমিন করে বলেছিল, তুমি খুশি হও নি?

— না, একটুও না!

গফুর চেঁচিয়ে উঠেছিল।

— আমারও ভাল লাগছে না?

একই মিনমিনে ভঙ্গিতে সলীমের মা বলেছিল। সে ঘটনার পুরো ছবিটা গফুরের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বুড়ি? বুড়ি যে কি পেয়েছে গফুরের তা বোঝার ক্ষমতা নেই। গফুর সে চেষ্টাও করে না।

বুড়ি এখন সাধক পুরুষের মত নিবেদিত চিত্ত। ব্যাপারটার মধ্যে সে সিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা আবিষ্কার করে। ও এখন মুরুব্বিরা যা বলে সব শোনে। একটুও

এদিক ওদিক করে না। খাওয়ার নিয়ম, গোসলের নিয়ম, রাত-বিরেতে বাইরে যাওয়ার নিয়ম কোনটাই বাদ দেয় না ও। মুরুব্বিদের চাপানো নিয়মগুলো বুড়ির মাথার উপর জগদ্দল পাথর। তবু দারুণ শান্ত মেয়ের মত সব পালন করে। একটুও কষ্ট নেই ওর। নিয়ম ভাঙ্গার দুর্বিনীত বেপরোয়া সাহসও নেই আর। গফুর মিটিমিটি হাসে— তুই একদম পাল্টে গেলি বুড়ি?

– পাল্টালাম কৈ? যখন যেমন তখন তেমন তো থাকতে হয়।

বুড়ি চোখ কপালে ওঠায়।

– ইস একদম লক্ষী মেয়ে। ক'দিন আগেও পাশের ঘরের চাচী কি বকাটাই না দিল তোকে।

– দেখ ভাল হবে না বলছি। সেতো মেলা দিন আগের কথা।

– ও তাই তো। ঠিক আছে একটু তামুক সাজ বুড়ি।

বুড়ি গম্ভীর মুখে তামুক সেজে আনে। গফুর ওর সঙ্গে রসিকতা করে। কখনো যেটা ওর একদম ভাল লাগে না। গফুর ওর গম্ভীর চেহারা দেখে আর কথা বাড়ায় না। পাছে কোন অঘটন ঘটে যায় সেজন্য বুড়ি এখন ভীষণ নিষ্ঠাবতী।

ঠিক আট মাস পর বুড়ির ছেলে হয়। মাস পোরে না। মুরুব্বীরা বলে আট মাসে ছেলে হলে সেই ছেলে ভাগ্যবান হয়। বুড়ি অতশত ভাবতে চায় না। শুধু ফুটফুটে সেই ছেলের দিকে তাকিয়ে ও যাবতীয় দুঃখ ভুলে যায়। নিজের মধ্যে ভয়ানক পরিবর্তন অনুভব করে। সে ছোট্ট শিশুর কচিমুখ ওর সমস্ত ভাবাবেগের শিকড় নাড়িয়ে দিয়ে গেল। কানে কানে বলে গেল, জীবনের অর্থ কত দ্রুত পাল্টে যায়। বুড়ি এখন অনেক বেশি আত্মস্থ। অস্থিরতা ওকে মাতিয়ে রাখে না।

ছেলের নাম রাখা হল রইস।

সলীম কলীম তো ছেলে দেখে মহা খাপ্পা। বাচ্চার হাত পা নেড়ে ওরা খুশি হতে পারে না।

– মা তোমাকে বললাম একটা বোন আনতে তুমি ভাই আনলে কেন?

– ঠিক আছে এর পরে একটা বোন আনবো।

– ভাই ভালো না খালি মারামারি হয়।

– আমার কোলে একটু দাওনা মা।

কলীম বুড়ির গা ঘেঁষে বসে। ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

– তুই ফেলে দিবি। দেখছিস না ও কত ছোট?

– ও বুঝেছি তুমি ওকে এখন থেকেই বেশি আদর কর।

– মোটেই না তোকে সবচেয়ে বেশি আদর করি।

বুড়ি কলীমের কপালে চুমু দেয়।

– তুমি যখন ঘরে থাকবে না তখন আমি ওকে বালিশ দিয়ে মেরে ফেলব। ঠিক মারব। তুমি তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদবে।

– তুই যেমন কাঁদিস অমন না রে?

বুড়ি হাসতে থাকে। সলীম কলীমের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। মুখে যত কথাই বলুক কলীমই রইসকে পছন্দ করে বেশি। ঘরে কেউ না থাকলে চুপিচুপি আদর করতে আসে। আর বেশি আদর করতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কাঁদিয়ে দেয়।

যত দিন যায় বুড়ি লক্ষ্য করে রইস যেন ঠিক স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে না। ওর দৃষ্টির মধ্যে আর দশটা ছেলের চপলতা নেই। ও কেমন বোকা হাবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওর সামনে শব্দ করলেও চমকায় না। ও বুক চেপে ধরে। দম আটকে আসতে চায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তবু খটকা লাগে। এত সাধের ছেলে কি ওর বোবা আর কালা হল!

তবু ধৈর্য ধরে বুড়ি। কাউকে কিছু বলে না। নিজে নিজেই ছেলেকে বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করতে থাকে। যতই দিন যায় বুড়ির ভয়টা গুটিসুটি পাকিয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে আশঙ্কাটা সত্যে পরিণত হয়। বুড়ি একদিন আর্তনাদ করে ওঠে।

— ওগো দেখতো রইস আমার ডাকে সাড়া দেয় না কেন?

গফুর অনুভব করে বুড়ির ডাকটা সব হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। ওর সর্বস্ব যেন খোয়া গিয়েছে। গফুরও ব্যর্থ হয়। না রইসের কোন রকম চেতনা নেই। ও আপন মনেই হাত-পা নেড়ে খেলে। হাসে। বাবা মা ভাইদের ডাকে ওর কিছু যায় আসে না। শব্দও করে না। রইসের হাবভাব লক্ষ্য করে গফুরও নিরাশ হয়। বুক ভার হয়ে থাকে। হ্যাঁ ঠিকই, পাশের ঘরের রমজান আলীর মেয়েটির মত ও সপ্রতিভ নয়। গফুরের মনে হয় সব অপরাধ ওর নিজের। বুড়ির মুখের দিকে ও চাইতে পারে না।

দিন যতই গড়াল ততই বুড়ির আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ করে দিয়ে রইস আর কথা বলল না। হাবা-বোবা ছেলেটা বুড়ির সুখের খাঁচার দ্বিতীয় ভাঙন। ওর মনে আর কোন নতুন ভাবনার জন্ম হয় না। অন্য কোন কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারে না। সব কিছু ঝেড়ে ফেলে রইসকে নিয়ে মেতে ওঠে। রইসই বর্তমানে ওর সব আনন্দের উৎস। ওর পঙ্গুত্ব, ওর অসহায়ত্ব বুড়ির মাতৃত্বকে আরো বেশি উদ্বেল করে। অনুভব করে ছেলেটা ওকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এমনকি গফুরের প্রতিও ওর বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। গফুর কোলে নিতে চাইলেও যায় না। কেঁদেকেটে নেমে আসে। একদিন গফুর ওকে জোর করে আদর করতে গিয়েছিল বলে নাকের ডগার ওপর খামচে দিয়েছিল। রাগে গফুর ওকে বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

— তোমার ছেলে তুমিই নাও।

বুড়ির খারাপ লেগেছিল। নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল গফুরকে। ক্ষেপে উঠেছিল ও নিজেও।

— ছেলে আছে বলে ওর মর্ম তুমি বোঝ না।

গফুর রাগে আর কথা বলেনি। প্রায় সাত আট দিন কথা বন্ধ ছিল দু'জনের।

কলীমের অনেক উৎসাহ ছিল রইসকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বোবা হওয়ায় কলীমও দমে যায়। কখনো রেগে ওঠে, মা ও কথা বলে না কেন? আমার একটুও ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে দুটো ঘুষি লাগিয়ে দেই।

বুড়ির বুক ভার হয়ে থাকে। ও কাউকে ওর বুকটা খুলে দেখাতে পারে না। সেখানে বেদনার পাহাড় গড়ে উঠেছে। কখনো রইসকে বুকের মধ্যে নিয়ে ফুঁপিয়ে

কেঁদে ওঠে। ওকে বেশি করে আঁকড়ে ধরে। রইসের যেমন মা, তেমন রইস ছাড়াও বুড়ির পৃথিবী অন্ধকার।

রইসের তিন বৎসর বয়সে বুড়ি আর গফুর আর একবার শ্রীনাইল ধামে যায়। কেশাবাবার নামে মানত করে নিম গাছের ডালে পুঁটলি বাঁধে। এবার আর গফুরকে সাধাসাধি করতে হয়নি। বুড়ির প্রস্তাবে হেসেছিল।

বলেছিল, তুই না বললেও আমি তোকে নিয়ে যেতাম বুড়ি। জানি তোর ইচ্ছার তৃপ্তি হয়নি।

– ছি ওকথা বলতে নেই।

– সত্যি করে বলতো রইসকে নিয়ে তুই খুশি হয়েছিস?

– বাপ হয়ে এমন কথা বলতে নেই।

বুড়ি সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। একটা পঙ্গু ছেলে তার মাকে ক্লান্তিহীন যন্ত্রণা ছাড়া আর কিইবা দিতে পারে? গফুর তা বোঝে। বোঝে বলেই বুড়ির মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

শ্রীনাইল ধামে যাবার সময় গফুরের মনে হয়েছিল কে যেন সারাপথ জুড়ে এক বিরাট কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। গতবারের মত বুড়ি এবার আর তেমন উৎফুল্ল নয়। পথের কষ্টে একটুতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। উপরন্তু রইস বিরক্ত করে। কান্নাকাটি করে। মেঠো পথে হাঁটতেও কষ্ট হয়। কয়েকবার পথের মাঝে গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিয়ে তারপর মেলায় পৌঁছে ও। কোন রকমে নিম গাছে পুঁটলি বেঁধে ঘরে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মেলায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও অনুভব করে না। বুড়ির চোখে-মুখে ক্লান্তি ছাড়া আকাঙ্ক্ষার কোন উজ্জ্বল আলোর রেখা আবিষ্কার করতে পারে না গফুর। ওর খুব খারাপ লাগে। মনে হয় বুড়ি হারিয়ে যাচ্ছে ওর জীবন থেকে। অথচ এবার ওর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। ও ছিল সাধক পুরুষের সাধনার মত নিবেদিত চিত্ত। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন আশঙ্কা গফুরকে পিছু টেনে রাখেনি। গফুর আবার বুড়িকে ওর আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে চায়। চায় বুড়ির সাহচর্যের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ, নির্মল আনন্দ আর বেড়ার মধ্যে আটকে থাকা ঘর-ঘর খেলার সুখ।

কিন্তু না ফল হয়নি। জীবনের সোনার গোলাপ আর ফুটল না। সঙ্গত কারণেই রইস বুড়ির জীবনে আরো অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গফুর সারাদিন বাইরে থাকলে, সলীম কলীম স্কুলে গেলে রইস ছাড়া পাশে আর কেউ থাকে না। মায়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায় ছেলে– পুকুরঘাটে, রান্নাঘরে, ঢেঁকিঘরে, সুপোরি বাগানে। রইস কথা বলতে পারে না বলেই একা একা কথা বলা বুড়ির অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এ জিনিসটা আগে ওর মধ্যে ছিল না। মনে হয় ওর মধ্যে একটা দিক পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেকে কেন্দ্র করে একটা অদলবদল ঘটছে। একা একা কথা বলতে দারুণ মজা লাগে। সুপোরি বাগানে লাল টকটকে সুপোরি কুড়োতে কুড়োতে বুকের ঝরনা খুলে যায়।

ও রইস, রইসরে তুই আমার একটা হাড়-জ্বালানি পরাণ-পোড়ানি পোলা হলি রে। তোরে নিয়ে আমার দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। তবু ভালো, তুই আছিস। না থাকলে তো সারা জীবন হা-হুতাশ করতাম। তুই আমার কানা ছেলে পদ্মলোচন।

বুড়ি শব্দ করে হেসে ওঠে। একটা লাল সুপোরি রইস মুখে পোরে। ও সেটা কোঁচরে পুরে রইসকে কোলে উঠিয়ে নেয়। বুকে জড়িয়ে ধরে। চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তোলে। রইস হাত পা ছুড়ে নিচে নামতে চায়। বুড়ি সজোরে জাপটে ধরে। ও তখন কেঁদে ফেলে। বুড়ি দুম করে ওকে মাটির ওপর বসিয়ে দেয়।

— মায়ের আদর তোর সয় না। হতভাগা ছেলে।

বুড়ির চোখ ছলছল্ করে। আঁচলে চোখ মুছে নেয়। রইস গুটিগুটি পা ফেলে বুনো আগাছার মধ্য থেকে একটা সুপোরি উঠিয়ে আনে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাসে।

ওরে দুষ্টু ছেলে মার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? আবার সুপোরি কুড়ানো হয়েছে। মাগো কত আমার উপযুক্ত ছেলে। হ্যাঁ রে রইস আমার বুড়ো বয়সে তুই আমাকে ভাত দিতে পারবি না? ওরে রইস বড় হলে মাকে কি তুই এখনকার মত ভালবাসবি না কি বৌর ন্যাওটা হয়ে যাবি?

রইস বুড়ির হাঁটু জড়িয়ে ধরে। দু'হাত বাড়িয়ে কোলে উঠতে চায়। ও রইসকে বুকে তুলে কোঁচড় ভর্তি সুপোরি নিয়ে ঘরে ফেরে।

মাঝে মাঝে অবাক হয় গফুর। আশ্চর্য ধৈর্য বুড়ির। কোন দিন ছেলের গায়ে হাত তোলে না, একটুও বিরক্ত হয় না। সারাক্ষণ যেন দেয়াল তুলে আগলে বেড়ায়। এখন বড় আনন্দের সময় রইসের।

গফুর হুঁকো টানতে টানতে বলে, তুই বড্ড বেশি সইতে পারিস বুড়ি? এমন মা আমি আর দেখিনি?

— আমি না সইলে ওর কে আছে বল?

গফুরের প্রশ্নের উত্তরে থমথম করে বুড়ির কণ্ঠ।

ছেলেটা কেন এমন হল বলত বুড়ি?

ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুপোরি কাটায় মন দেয়। গফুরের হুঁকো থেকে গুড়গুড় শব্দ হয়। এক সময় সুপোরি কাটা থামিয়ে গফুরের মুখের দিকে তাকায়, ওগো আমার বোধহয় কোন পাপ ছিল।

গফুরের হুঁকো টানা থেমে যায়।

— না বুড়ি না। সব বাজে কথা।

বুড়ি ফিকে হাসে।

— মুরুব্বিরা তো বলে।

— ধুত! ওদের আবার কথা। ওরা মানুষের দোষ ধরতে পারলে বাঁচে।

গফুর আবার হুঁকো উঠিয়ে নেয়। বুড়ি সুপোরি কাটে। কেউ কথা বলে না। কেবল কিছু শব্দ হয়। শব্দটা ছড়িয়ে যায় বাতাসে বাইরে ঘুটঘুটে রাত। আজ অমাবস্যা। ছেলেরা ঘুমিয়ে গেছে। বুড়ি কুপি উস্কে দিয়ে উঠে যায়। গফুর বুড়িকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হাজার রকম চেষ্টা করে। জানে ও আগলে ধরে না রাখলে বুড়ি ভেঙে যায়। ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। চুপচাপ গিয়ে পুকুরঘাটে বসে থাকে। আসলে পাপ নয়। পাপের কথায় গফুরের বিশ্বাস নেই। পবিত্র ফুলের মত বুড়ি। পাপের স্পর্শ কেন থাকবে ওর জীবনে। ও তো কোথাও কোন ফাঁকি দেয়নি। কাউকেও ঠকায়নি। তবুও কেন যে এমন হয়ে যায় জীবনটা!

এক সময় যৌবনের দিন ফুরিয়ে যায়। শীতে বর্ষায় বসন্তে টুপটাপ পাতা অনবরত ঝরে। বিরোধহীন দিনগুলো নির্বিবাদে গড়ায় ওদের। জলিল কয়েকবার গাঁয়ে এসেছে একবারও দেখা করেনি বুড়ির সঙ্গে। ওর মেয়ে হয়েছে দু'টো। কারো কারো কাছে জলিলের কথা জিজ্ঞেস করে বুড়ি। ও নাকি ভালই আছে। শহরে একটা দোকান করেছে। এখন আর রিকশা চালায় না। গফুরের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। হাঁপানি ধরেছে ওকে। জমজমাট কাশি। রাতে ঘুমোতে পারে না। ঘোলা চোখে বুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর জন্যে খারাপ লাগে। বুড়ির শরীর এখনো ভাঙেনি। ও কোমর সোজা করে হাঁটে। গফুরের হাঁটতে কষ্ট হয়! কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয় দিন ফুরিয়েছে। তখুনি বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা চড়চড়িয়ে বাড়ে। যৌবনের দিন ফিরে পেতে ইচ্ছে করে কেবল। পায় না বলে মেজাজ খারাপ থাকে। সবার সঙ্গে রাগারাগি করে। রইসকে দুমদাম পিটুনি দেয়। বুড়ির সঙ্গে খেঁকিয়ে কথা বলে। ও রাতদিন সেবা করে। গফুরের মন ভরে না। সব সময় খুঁত-খুঁত করে। একদিকে অসুস্থ স্বামী, অন্যদিকে পঙ্গু ছেলে দুয়ের মাঝে ও হিমশিম খায়। কখনো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। জলিলের কথা মনে হয়। জলিল ওর সঙ্গে আর দেখা করে না। অনেকদিন ও গাঁয়ে আসে না। শহরে জলিল বেশ গুছিয়ে বসেছে। জলিলকে দেখার বড় সাধ হয়। যখন ও কাছে আসতো তখন অত টান ছিল না। দূরে সরে গিয়ে জলিল বুড়িকে উদাস করে দিয়েছে। এখন ওর মনের মধ্যে ব্যাকুল আর্তনাদ।

বুড়ি বুঝতে পারে না যে বুড়ো বয়সে গফুর কেন এত বদলে গেল? যে মানুষটা ওর জীবনের চারদিকে একটা বেড়া রেখেছিল সে এখন বেড়া ভাঙা পাগলা ঘোড়া। ওকে তছনছ করে দিতে চায়। ওর জীবনে এখন পারিবারিক শান্তি নেই। গফুর ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া বুড়িকে আক্রান্ত করে রাখে। রইসকে নিয়ে ক্ষেতে লাল শাক তুলতে গেলে ওর সঙ্গে কথা বলে, বুঝলি রইস তোর বাপটা একটা আস্ত হারামী। মাগো মা এমন লোক আমি দেখিনি। হতো যদি আমার জলিলের সঙ্গে বিয়া তাহলে ঠিক হতো। এখন শহরে থাকতে পারতাম রে রইস। উঃ কি যে মজা হতো। কেমন করে গাড়ি যায় ভোঁ বাজিয়ে দেখতে পেতাম। দেখতাম শহরের মানুষকে। রইসরে তুই বড় হয়ে শহরে একটা চাকরি নিবি। তারপর আমাকে নিয়ে যাবি শহরে। ছয় মাস রাখলেই হবে। কি রে পারবি না? অমা হাঁ করে দেখছিস কি?

রইস অবাক হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চট্ করে একটা লাল শাকের মাথা ভেঙে বুড়ির দিকে এগিয়ে দেয়। রইসকে বুকে তুলে কোঁচড় ভর্তি লাল শাক নিয়ে ঘরে ফেরে। রান্না ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শাক বাছতে বসে। ঘর থেকে গফুরের কাশির শব্দ আসে। বুড়ি, বুড়ি করে কয়েকবার ডাকে। ও সাড়া দেয় না। দিতে ভালো লাগে না। গফুর ডেকে ডেকে চুপ করে যায়।

বেশ অনেক দিন অসুখে ভুগল গফুর। রইসের ঠিক তেরো বছরের মাথায় দু'দিনের জ্বরে মারা গেল। কোনো কিছু ভাবার বা বোঝার অবকাশ ছিল না বুড়ির। অসুস্থ অবস্থায় ভীষণ জ্বালিয়েছে গফুর। কিন্তু মারা যাবার পর কেমন নিথর হয়ে গেল বুড়ি। একটা লোকের অস্তিত্ব যখন নিঃশেষ হয়ে যায় সে তখন পরিবারে পরিজনের

সবাইকে অনুভবে গতিশীল করে। সে কারণেই গফুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বুড়ির বুকের ভেতরের সবুজ বন হলুদ হয়ে যায়। লাল গোলাপের পাপড়িগুলো অকালে বাতাস ছাড়াই ঝরে যেতে থাকে। বুড়ি একলাফে বেশ বয়স্ক হয়ে যায়। মাথার চুল সাদায় ভরে ওঠে।

সলীম সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ও আরো ধীর স্থির এবং গম্ভীর হয়েছে। সাংসারিক বুদ্ধিও খুব। অল্প কয়দিনেই সব গুছিয়ে ফেলে। জমিজমার হিসেব বোঝে চমৎকার। ধানের গন্ধে ও ছটফট করে। রাতে ঘুমোতে পারে না। ধান মাড়াইয়ের সময় সারারাত বারান্দায় বসে কাটিয়ে দেয়। সলীমের সব কিছু বুড়ির ভাল লাগে। রইস নির্বোধের মত বারান্দায় বসে থাকে। কখনো উড়ে যাওয়া পাখির দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে। কুকুরটার সঙ্গে ওর ভারি ভাব। কুকুরটাও বেশির ভাগ সময় রইসের সঙ্গে সঙ্গে কাটায়। ওর আদর নেয়। ওর দিকে তাকালে বুড়ির আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। ও এখন বুড়ির সঙ্গে সুপোরি বাগানে যায় না কিংবা শাক তোলে না। বুড়িও ডাকে না। বুড়ি আরো একলা হয়ে যায়।

কলীম চড়া গলায় গান গায়। ভাটিয়ালী সুরের আমেজ ওর গলায় অদ্ভুত আসে। বুড়ি মাঝে মাঝে মনোযোগ দিয়ে শোনে। ভাললাগে। বাপের মতো স্বভাব হয়েছে ওর। ভোর রাতে উঠে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। ডাকাডাকি করে মাকে ওঠায়। জালটা আর খলুইটা যাবার সময় হাতে বুড়িরই তুলে দিতে হবে। নইলে ও কিছুতেই যাবে না। সন্ধ্যা রাতে বুড়ি জাল, খলুই ওর জন্যে গুছিয়ে রাখে। তাতে হয় না। ও বলে, তুমি আমার হাতে জাল তুলে না দিলে মাছ পাব না। বুড়ি জানে, এটাই কলীমের স্বভাব। ছোট থেকেই ওর ওপর এমনি আবদার করে আসছে। ভোর রাতে উঠতে অবশ্য বুড়ির খারাপ লাগে না। কলীম সুপোরি বাগানের আড়াল থেকে চিৎকার করে, মা, মাগো আসি। তারপর লাফিয়ে ডিঙিতে ওঠে। তখন শুরু হয় গান। গান গাইতে গাইতে ও যখন আঁধারে মিলিয়ে যায় তখন অদ্ভুত একটা রেশ জেগে থাকে বুড়ির মনে। ভেসে আসা গানের ক্ষীণ সুর ধরে ও অনুভব করে এমন অনেক ভোর-রাত ওর নিজের স্মৃতির কৌটায় জমা আছে। একটুও নষ্ট হয়নি। একটুও দাগ পড়েনি। তবে গান গাইত না গফুর। বুড়ি সঙ্গে থাকত বলে। কেবল ওর হাতটা ধরে দ্রুত সুপোরি বাগান পেরিয়ে যেত। কোন দিন সুপোরি বাগানের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। বাদুড়ের পাখা ঝাপটানীতে ভয় পেয়ে গফুরের বুকের সঙ্গে মিশে যেত। বুড়ি কৌটার ঢাকনাটা বন্ধ করে দেয়। ভাবে, ছেলেদের জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতায় কোন অসঙ্গতি নেই। সব ঠিক আছে। হাল বাওয়া, ধান বোনা, ধান কাটা, ধান মাড়াই, মাছ ধরা, ডিঙি বাওয়া। শুধু গফুর নেই। আর গফুর নেই বলে বিরাট কোন পরিবর্তন হয়নি। ওদের জীবনে ঝড় ওঠেনি। দারুণ রদবদলে দিকভ্রষ্ট হয়নি কেউ। কেবল একটা ছায়া আর উঠোনে পড়ে না। কাঁধের উপর জাল ফেলে কিশোরী বউয়ের হাত ধরে জলে যায় না। জলের সঙ্গে ভালবাসার খেলা গড়ে তোলে না। অনেক রাতে হাট থেকে ঘরে ফিরে বুড়ির নাম ধরে ডাকাডাকি করে না। এইসব ভেবে বুড়ির বুক যখন চেপে আসে তখন জলিলের কথা ভাবে। জলিলের ভাবনায় বুকের ভেতর অন্যরকম স্রোত অনুভব করে। সে স্রোতে ভেসে যায় পার্থিব যাবতীয় পঙ্কিলতা। জলিল মানেই অলৌকিক ঈশ্বর। বুড়ির

নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান আনন্দ। যে আনন্দ ব্যতিক্রমী স্রোতে প্রবাহিত হয়ে ওকে অপার্থিব সুখ দেয় এবং প্রতিদিনের সংসারের বাইরে নিয়ে যায়।

সলীম কলীম না থাকলে বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে। বুড়ি কখনো আপন মনে বকবক্ করে। ও রইস, রইসরে তোকে কি আমি এমন করে চেয়েছিলাম। ওই হাবা ছেলেটা একবারও মা বলে কি ডাকতে পারিস না? তোর কাছ থেকে মা ডাক শোনার জন্যে আমার প্রাণটা ফেটে যায় রে? কত সাধ ছিল মনে, কত সাধ্যি-সাধনা করলাম? বোবা ছেলেটা তোর মুখ দিয়ে কথা ফোটাতে পারলাম না? এমন চুপ হয়ে থাকিস কি করে? মাগো মা? রইসরে ও রইস একবার মুখটা খোল বাবা? আমার সোনার ছেলে বুকের মানিক সাত রাজার ধন? একবার হাঁ কর আমি তোর কাছ থেকে একটু শব্দ শুনি? এই আমি তোর মুখের কাছে কান রাখলাম। বল বাবা বল? একবার বল? মা বলে প্রাণ খুলে ডাক দে? সেই ডাকে মাঠ-ঘাট বন-প্রান্তর আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠুক? সেই ডাকে গাঁয়ের সব মানুষগুলো দৌড়ে তোর কাছে ছুটে আসুক? অবাক হয়ে দেখুক তোর শক্তি, তোর ক্ষমতা? প্রমাণ হোক তুইও হাঁক ছাড়তে পারিস। ও রইস, রইসরে তোকে নিয়ে আমি কি করব? তুই কোন্ কাজে লাগবি? হাল বাইতে পারিস না, মাছ মারতে পারিস না, সংসার দেখতে পারিস না। আঃ বুকটা আমার কেমন যে করে। আমি চাই তুই একটা কিংবদন্তি হয়ে যা রইস, রইসরে?

বুড়ি হঠাৎ করে রইসকে ঝাঁকুনী দেয়। খামচে ধরে ওর দুই কাঁধ। রইস ফ্যালফ্যাল করে মা-র দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। ও শব্দ করে কাঁদে না। সে অশ্রুর দিকে তাকিয়ে থমকে যায় বুড়ি। রইসের মাথাটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সংসারের আকর্ষণ বুড়ির শিথিল হয়ে আসে। সাদা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সলীম কাছে এসে বসে।

— মা তুমি কি এত ভাব?

— কই রে? বুড়ি হেসে ফেলে।

— হ্যাঁ ভাব। অন্য ঘরের চাচি খালার মত তুমি সংসার কর না। সারাদিন ব্যস্ত থাক না। ঝগড়া কর না। এত চুপচাপ থাক কেন মা?

— আমি ভাবছি তোর বিয়ে দিয়ে বৌ আনব ঘরে। সে এসে সংসার দেখবে। আমার এবার ছুটি।

— হ্যাঁ, তাহলে তো তোমার পোয়াবারো। যেটুকু সংসারে ছিলে তাও থাকবে না। সেটি হবে না।

— আমার তো বয়সও হয়েছে সলীম। তুই মত দিলে হয়। আমি মেয়ে দেখি। তোরা সারাদিন থাড়ি থাকিস না। ঐ বোবা ছেলেটাকে নিয়ে আমার একলা কি করে যে কাটে সে তোরা কি বুঝবি? তুই না করিস না বাবা?

বুড়ি সলীমের হাত চেপে ধরে। সলীম মুখ নিচু করে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে।

— ঠিক আছে দেখ। কিন্তু তোমার মনের মত হওয়া চাই। বৌ দিয়ে তুমি কষ্ট পাবে সে আমার সইবে না।

সলীম মা-র সামনে থেকে পালিয়ে যায়। বুড়ির খুশি লাগে। ইচ্ছে করে পুকুরে ঝাঁপিয়ে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসতে। ওর ঘরে লোক আসবে। বাড়তি একজন মানুষ। বুড়ি এখন মানুষ চায়। চারদিকে অগণিত থৈ-থৈ মানুষ।

এর মাঝে একদিন নীতা বৈরাগিনী আসে। বুড়িকে দেখে চোখ কুঁচকে তাকায়।

— তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমাদের বয়স হয়েছে সই।

বুড়ি ম্লান হাসে।

— বেলা তো অনেক হলো।

নীতা পা ছড়িয়ে বসে। আজ ও একা।

— তোর মনের মানুষ কৈ সই?

— আসেনি। বলল আমি বেরুতে পারব না। তুই ভিখ মেগে নিয়ে আয়। ও এখন এমনই করে।

— কেন চিড় ধরেছে বুঝি?

— এক রকম তাই। বড্ড জ্বালায়। ভাল লাগে না। একদিন ছেড়ে ছুড়ে চলে আসব।

বুড়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

— হাঁ করে দেখছিস কি? চাট্টি খেতে দে। যাই। ফিরতে দেরি হলে আবার রেগে যাবে।

বুড়ি ভাত আনতে যায়। মনে মনে ভাবে, নীতা যেন একটু বদলে গেছে। ও আর আগের মত নেই। তখন ও নিজের সঙ্গে কথা বলে, ও বুড়ি তুই কি কম বদলেছিস? তুই তো আর আগের মত নেই। এমনি হয়রে বুড়ি। এমনি হয়। কেউ চিরকাল একরকম থাকে না।

— ও সই কৈ রে ভাত দিবি না?

ও আবার তৎপর হয়। ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাত শিথিল হয়ে এসেছিল। ভাতের সানকি আর জলের গ্লাস নিয়ে আসতেই নীতা খেঁকিয়ে ওঠে।

— তুই একদম ভারী হয়ে গেছিস। বাব্বা চাট্টি ভাত খাওয়াবি তাও আবার তাগাদা দিতে হয়। নাহ্ তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস সই?

নীতার কলাপাতায় ভাত ঢেলে দিতে দিতে ম্লান হাসে বুড়ি। কথা বলে না। নীতা তাড়াহুড়ো করে খায়। বুড়ি এক কোঁচড় চাল দেয় ওকে।

— বাঁচালি সই। আজ আর দোরে দোরে যেতে হবে না।

নীতা কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে। ওর শরীরটা গাছ-গাছালির আড়ালে মিলিয়ে যাবার পরও বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে। নীতা একটা দমকা ঘূর্ণির মত আসে। কিছুক্ষণ ধুলো উড়িয়ে সব কিছু এলোমেলো করে আবার চলে যায়। উঠোনে এঁটো কলাপাতা গড়ায়। বুড়ি সেদিকে তাকিয়ে থাকে। না, নীতা আর কিছুই ফেলে যায়নি। অথচ কেন যে মনে হচ্ছে সারা বাড়ি জুড়ে নীতা দাপিয়ে হাঁটছে। সে শব্দ বুড়িকে অস্থির করে তুলেছে।

দু'মাসের মধ্যেই ঘটা করে সলীমের বিয়ে হয়। সলীমের বৌ রমিজা, ছোটখাটো মিষ্টি মেয়ে। হাসি-খুশি। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগে। বিয়ের পরদিন বুড়ি ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের বাড়ির সীমানা দেখাল।

— বুঝলে বৌমা এখন থেকে এসব তোমার। আমি আর কেউ না। আমাকে চারটে খেতে দিও তাতেই হবে।

রমিজা কথা বলে না। ঘোমটার ফাঁকে উৎসুক চোখ মেলে রাখে।

— জায়গাটি তোমার মনে ধরেছে বৌমা?

রমিজা মাথা নাড়ে।

— পারবে না সামাল দিতে।

— আপনি দেখিয়ে দিলে পারব।

— অমা দেখ মেয়ের বুদ্ধি। আবার আমাকে জড়ানো হচ্ছে। আমি আর নেইগো মেয়ে। এবার আমার ছুটি।

বুড়ি রমিজার থুতনি নেড়ে আদর করে। মাথার ঘোমটা টেনে ফেলে দেয়।

— এত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে সংসার দেখবে কে?

রমিজা লজ্জা পায়। বুড়ি হাসে।

— আমাকে তোমার শরম কীসের বৌমা। আমি তোমার মায়ের মত। কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। আমি তো আছি তোমার জন্যে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে সুপোরি বাগান ছাড়িয়ে পুকুর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। সবকিছু রমিজার ভাল লাগে। শ্বশুরবাড়ির অজানা ভীতি ওকে কাবু করে রাখে না। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুক দুলে উঠে। বাপের বাড়ির মায়াময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেও ও উপলব্ধি করল গভীর মমতাময় বুকের ছায়া ওর জন্যে উন্মুক্ত আছে। ওর কোন অভাব নেই।

ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বুড়ি রমিজাকে বলে, যাও মা দেখ সলীমের কি লাগবে? ও যা পাগল ছেলে। একটু এদিক ওদিক হলে রেগে কাঁই হয়ে যায়।

রমিজা মাথার ওপর ঘোমটা টেনে চলে যায়। বুড়ি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পুকুরের পানির কাছে এসে বসে।

অল্পদিনেই রমিজা সংসারের সব দায়িত্ব তুলে নেয়। চমৎকার গোছানো মেয়ে। বুদ্ধিও রাখে। দেখে শুনে বুড়ি হাফ ছেড়ে বাঁচে। মনে হয় সংসারের বোঝাটা কাঁধের ওপর নিয়ে দীর্ঘদিন একটানা এক সবুজ বনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। এখন বোঝাটা পথের ধারে নামিয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে সোনালী পাতা ঝরে। স্বপ্নের কোকিল প্রশান্তি হয়ে ডাকে। কোন ভীষণ শব্দে সে ঘুম ভাঙে না। কেবল রইস রয়ে যায় ওর জন্যে। সকাল বেলা ওকে এনে বারান্দায় বসিয়ে রাখে। পুকুর ঘাটে নিয়ে গোসল করায়। খাওয়ায়। বুড়ো বয়সে বুড়ির যেন নতুন করে পুতুল খেলা। ওর মাঝে মাঝে মজা লাগে। শৈশব কৈশোর চোখের সামনে দীপ্ত আলো জেলে হাজির হয়। বুড়ি কখনো তন্ময় হয়ে যায়। আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে রইসের। যে দেখে সে অবাক হয়। বয়সের চাইতে অনেক বড় দেখায়। মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারে না ছেলেটি বোবা-হাবা-কালা। ছেলেটির কোনো বোধশক্তি নেই। ও এই পৃথিবীর বাইরে

বসে করে। মাঝে মাঝে ওর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে বুড়ি। বুক দুমড়ে মুচড়ে উঠে। সব দুঃখ বোধগুলো একাকার হয়ে বুকের মধ্যে এক বিরাট নদী হয়ে যায়। তখন নদীর বালুচরে হাঁটতে গিয়ে বুড়ি প্রকৃতির কাছে এসে দাঁড়ায়। শৈশবের মত, কৈশোরের মত ঘর ভাল লাগে না। খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে নৌকোর চলে যাওয়া দেখে। শিমুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে যাবার রাস্তায় মানুষের যাতায়াত দেখে। এসব দেখতেই ভালো লাগে এখন। মা নেই শাসন করার জন্যে। স্বামী নেই ঘরে ডাকার জন্যে। বুড়ি এখন অবাধ স্বাধীন। ছেলেরা নিজেদের কাজে নিয়ে ব্যস্ত। রমিজা রান্নাবাড়ি সামলায়। রইস কখনো বুড়ির সামনে থাকে। কখনো থাকে না। ওকে নিয়ে বুড়ির কোন ঝামেলা নেই। বুড়ি মনের সুখে সুপোরি খোঁজে, কোঁচড় ভর্তি লাল শাক উঠিয়ে আনে। নইলে পুকুর পাড়ে বসে মাছ ধরে। বুড়ির এখন থৈ-থৈ আনন্দ! সময় ভালই কাটে

রমিজা বুড়িকে ভীষণ ভালবাসে। আদর যত্ন করে। যেন কোন কিছুতে অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসা এবং শোনা অনেক দজ্জাল শাশুড়ির ধারণা বুড়ি ভেঙে দিয়েছে। বুড়ি যেন অবিকল রমিজার আপন মা। কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাও রমিজাকে তাড়িত করে।

— আম্মা আপনার যখন যা দরকার হয় আমাকে বলবেন।

রমিজা বুড়ির পায়ে তেল মালিশ করতে করতে কথা বলে। বুড়ি চোখ বুজে আদর উপভোগ করে। মেয়ে নেই বুড়ির। মেয়ে থাকলে এমন হয়। কাছে থাকে, ভাত এগিয়ে দেয়, মাথা আঁচড়ে দেয়, বিছানা ঠিক করে রাখে। এই অভাব বুড়ি রমিজা আসার পর অনুভব করছে। রমিজার কথায় ও মনে মনে হাসে। সব দরকারের কথা কি আর রমিজাকে বলা যায়? ওর যে কত অজস্র ভাবনা তা রমিজার মত ছোট মেয়েকে কি করে বোঝাবে? রমিজা বুড়ির সঙ্গী হতে পারে না। ওর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাও বলা যায় না। তবে ওর আদর বড় ভাল লাগে। মনে হয় জীবনে একটা সুর বেজে ওঠে থেকে থেকে। যে সুরের সঙ্গে ওর কোন পরিচয় ছিল না। তবে বড় ক্ষণিকের সে বোধ। মুহূর্তে আবার কোথায় যেন সব হারিয়ে যায়। আর কিছুই খুঁজে পায় না। রমিজার সাধ্য নেই বুড়ির মনের তল খুঁজে পাওয়ার। দুপুরবেলা বুড়ির পাশে শুয়ে ও অনেক কথা বলে। ওর বাবার কথা, মার কথা, গাঁয়ের কথা। মাঝে মাঝে খাপছাড়া কথা বলে। কথা বলতে বলতে ও তন্ময় হয়ে যায়।

— জানেন আম্মা ছেলেবেলায় কাদার মধ্যে মাছ কুড়োতে আমার খুব ভাল লাগত। আশ্বিন মাসে মাঠ থেকে পানি নেমে গেলে সাদা বকের ঝাঁক নেমে আসতো সে কাদায়। আমরা সব ছেলে-মেয়েরা বকের মত মাছ খুঁজতাম। কি যে মজা হত তখন।

রমিজার কণ্ঠ বদলে যেত আস্তে আস্তে। ও খুব সুন্দর করে বলতে পারত। ওর গল্পে বুড়ি কখনো নিজের স্মৃতি ফিরে পায়। কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শোনে। বুড়ির নিজের সঙ্গে মিলে গেলে সে ঘটনা শুনতে খারাপ লাগে না। রমিজার সঙ্গে বুড়িও তাল দেয়। কিন্তু রমিজা অন্য প্রসঙ্গে গেলে বিরক্ত হয়। মেয়েটা কথা একবার আরম্ভ করলে আর থামিতে চায় না। পাশ ফিরে শোয়। রমিজা বুঝতে পারে না বুড়ির বিরক্তি। একটানা বলে যেতে থাকে। একসময়ে থামে। বুড়িকে ডাকে।

— ও আম্মা', আম্মা?

বুড়ি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

— আমার কথা শুনলে আম্মার ঘুম পায়।

রমিজা হাই তোলে।

সলীম ওকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয় না বলে মন খারাপ করে থাকে প্রায়ই। বুড়ির মনে হয় রমিজাও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। বাপের বাড়ির স্বপ্ন। ফেলে আসা দিনগুলোর স্বপ্ন। শৈশব-কৈশোরের সেই গাঁ-টা ওর কাছে এখন অচিনপুরী হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই আর ছুটে যেতে পারে না। হেসে খেলে বেড়াতে পারে না। রমিজা এখন বন্দী জীবনযাপন করছে। সলীম যে কেন ওর সঙ্গে এমন করে তারও হদিস পায় না বুড়ি। ছেলেকে এখন আর বোঝার ক্ষমতা নেই। অনেক বদলে গেছে সলীম। সারাদিন ব্যস্তও থাকে খুব। রাত করে ঘরে ফেরে। ফিরে চারটে খেয়ে সটান ঘুম। কথা বলতে চাইলে বিরক্ত হয়। ওর নাগালই পায় না বুড়ি।

— আম্মা আপনি রাতদিন কি এত ভাবেন?

— কৈ? কিছু ভাবিনা তো?

— উঁহু ভাবেন। আমি টের পাই।

বুড়ি অবাক হয়। রমিজা কি টের পায়? কতটুকু বোঝে ও?

— রইসের জন্যে আপনার মন খারাপ থাকে না আম্মা?

— হ্যাঁ তা থাকে। ছেলেটার যে কি হবে?

— কি আর হবে। আল্লাহ্ আছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

রমিজা বিজ্ঞের মত কথা বলে। ও যখন মুরুব্বি সাজে বুড়ির তখন বেশ ভাল লাগে। মেয়েটা একদম সরল। মনটা ভাল। কোন ধরনের কুচিন্তা করে না। বুড়ির মনে হয় ওর চারপাশের মানুষগুলো ঠিক ওরই মত। ওর সঙ্গে ভাঁজে ভাঁজে মিলে যায়। না, ঠিক তা নয়। ধাক্কা কি খায়নি বুড়ি? দেখেনি কি হিংসা, ঝগড়া, রেষারেষি? আসলে এসব বুড়ি ভাবতে চায় না। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রাখে।

তবুও খারাপ লাগে যখন দেখে সলীম রমিজাকে মারে। সলীমের অভিযোগ, ও নাকি কোন কাজের না। বুড়ি ভেবে পায় না কেন? লক্ষ্মী মেয়ে রমিজা। গুছিয়ে সংসারের কাজ করে। ছিমছাম পরিপাটি। কোথাও কোন গলদ নেই। তবুও সলীম ওর ওপর বিরক্ত। অভিযোগের অন্ত নেই। রাত্রিবেলা পাশের ঘর থেকে সলীমের শাসানী এবং ধমকানি কানে আসে বুড়ির। রমিজা যখন গুনগুনিয়ে কাঁদে তখন বুড়ির দম আটকে আসতে চায়। সলীমের আচরণ ওর কাছে বড় অদ্ভুত লাগে। সলীমকে জিজ্ঞেস করতে ওর বাধে। এতদিনে বুড়ির মনে হয় ওর অভিজ্ঞতার বাইরেও অনেক কিছু ঘটে। যে ঘটনাকে বুঝতে যাওয়া বোকামী। বুঝতে না চাইলে যন্ত্রণা। প্রথমদিকে বুড়ি সলীমের আচরণে আপত্তি করেছে। ওর ওপর রাগ করেছে। রাগে কাজ না হওয়ায় অনুনয়-বিনয় করেছে। কিন্তু কিছুই শোনেনি সলীম। একদিন রেগে গিয়েছিল, তুমি আমার ব্যাপারে বুঝবে না মা। তুমি চুপ থাক। সব ব্যাপারে নাক গলাতে আস কেন?

সলীমের তীব্র ভাষায় থমকে গিয়েছিল বুড়ি। অপমান লেগেছিল। সলীমের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। দু'দিন মন খারাপ

ছিল। মনকে অনেক বুঝিয়েছে। ঠিকই বলেছে সলীম। ও বড় হয়েছে ওর ব্যাপারে মাথা ঘামানো একদম উচিত না। কিন্তু রমিজা যখন কাঁদে তখন সইতে পারি না যে! বুড়ি নিজেকে ধমকায়। সইতে হবে। না সয়ে উপায় কি? রমিজাকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার সলীম পেয়েছে।

এখন বুড়ি চুপই থাকে। কিছু বলে না। মাঝে মাঝে রমিজার ত্রুটি আবিষ্কারে তৎপর হয়। কেন ও সলীমকে খুশি করতে পারে না? পরক্ষণে নিজেকে আবার শাসন করে। ছিঃ মা হয়ে এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। তাছাড়া রমিজাই বা ওকে কি ভাববে? একদিন রাতে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল সলীম। রমিজা কাঁদতে কাঁদতে বুড়ির পাশে এসে শুয়েছিল। বুড়ি ওর সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু হাত বাড়িয়ে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়েছিল শুধু স্পর্শ দিয়ে। সান্ত্বনা দিয়েছিল ওকে। শাশুড়ির আদরে বেশি করে কেঁদেছিল রমিজা। তবু বুড়ি জিজ্ঞেস করেনি যে সলীমের সঙ্গে কি হয়েছে। শেষ রাতের দিকে সলীমের মৃদু শাসানীতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখে ওকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ি সাড়াশব্দ না করে চুপ-চাপ শুয়ে থাকে। তখন বুড়ির মনে হয়েছিল ব্যাপারটা একান্তভাবেই ওদের দু'জনের। সেখানে বাইরের কারো কিছু করার নেই। তারপর থেকে ওদের ব্যাপারে আর মাথা ঘামায়নি। সলীম যখন রমিজাকে মারে তখন পুকুর পারে বসে থাকে। নইলে পড়শীর ঘরে চলে যায়। ভীষণ কথা বলে। হাসে, অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে। যদিও মন পড়ে থাকে রমিজার কাছে। সলীম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ফিরে আসে। রমিজার মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। রমিজা কোন কথা বলে না। বুড়িও না। এজন্যে মাঝে মাঝে বুড়ি অবাক হয়। রমিজার মুখে কোন অভিযোগ নেই। সলীমের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বড় নীরবে সয়ে থাকে।

এদিক থেকে কলীম অনেক শান্ত, রাগ কম। বুড়ি মনে মনে ভাবল কলীমের একটা বিয়ে দিতে হবে। ওর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আসলে যত শান্তই হোক বিয়ে দিলে ও নিজেও হয়ত বউকে মারবে। কোন কোন পুরুষ আছে যারা বউর ওপর বীরত্ব দেখাতে ভালবাসে। বাইরে সমকক্ষ পুরুষের সঙ্গে পারে না বলে ঘরে তাদের যত আস্ফালন। অবশ্য কলীম এমন নাও হতে পারে। ও খুবই ভাল ছেলে। কলীমের প্রতি বুড়ির পক্ষপাতিত্ব আছে। মনে মনে কলীমের জন্যে মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে সমান মৃধার মেয়েটা চোখে পড়ে যায় বুড়ির। কলীমের সঙ্গে বেশ মানাবে।

রাতে খাবার সময় দু'ভায়ের সামনে কথাটা পাড়ে। সলীম সারাদিন বাড়ি ছিল না। কোথায় কোথায় ঘুরেছে কে জানে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। অন্য সময় তো ওকে ধরাই যায় না। দু'দণ্ড বসে কথা বলার জো নেই। সংসারের কাজের কথাও শুনতে চায় না। বলতে গেলেই, পরে হবে মা বলে বেরিয়ে যায়। বুড়ির মাঝে মাঝে রাগ হয়। কি এত রাজকাজে ব্যস্ত ও? সলীম খুব তাড়াতাড়ি ভাত খাচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে চাইছে না। সলীমকে উদ্দেশ্য করে বুড়ি বলে, কলীমের একটা বিয়ে এবার দিতে হয় বাবা? দু'ভায়ে একসঙ্গে আপত্তি করে।

— এখন না মা?

— কেন? এখন নয় কেন? আমি মরলে হবে?

বুড়ি রেগে যায়। উত্তর দেয় সলীম।

– তুমি আজকাল বড় তাড়াতাড়ি রেগে যাও মা।

– তাতো বলবি। তোরা এখন বড় হয়েছিস না?

– শোন, মাথা ঠাণ্ডা কর। তুমি তো কিছু জান না, দেশের অবস্থা এখন একদম ভাল না।

– ওমা দেশের আবার কি হলো? জ্বর এলো নাকি?

বুড়ি হেসে ওঠে। রমিজাও খুকখুক হাসে। রেগে যায় সলীম।

– আঃ মা যা বোঝ না তা নিয়ে হাসাহাসি করো না। আমাদের সামনে একটা কঠিন সময় আসছে।

সলীম ঢকঢক করে পানি খায়। কলীমও মুখ নিচু করে খেয়ে যায়। বুড়ি ভাত নাড়াচাড়া করে। ওদের খাওয়া হলে ও আর রমিজা খাবে। জিহ্বার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অকস্মাৎ পুরো ঘরে নীরবতা নেমে আসে।

সলীম আজকাল গাঁয়ের একজন মাতব্বর গোছের লোক হয়েছে। ও এখন অনেক বোঝে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। বুড়ির চোখের সামনে দিয়ে ছেলেটা বদলে গেল। বুড়ির ভালই লাগে। পেটের ছেলে না হলে কি হবে সলীম কলীমের সঙ্গে ওর একটা আত্মিক যোগ আছে। সে যোগ নাড়ি-ছেঁড়া ছেলের চাইতে কম না। বুড়ির বুকের মধ্যে অহংকার জন্মায়। কাচারীঘরে সারাক্ষণ লোকজন আসা-যাওয়া করে। কখনো জোরে, কখনো ফিসফিসিয়ে কি সব কথাবার্তা বলে ওরা। বুড়ির মনে ভাবনা জোটে। কি হলো দেশটার? কৈ বুড়ির এত বছরের জীবনে হলদী গাঁ-র কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। মৌসুমী ফসল বোনা, সময়ে ফসল কাটা। কোন বছর ভরা গোলা, কোন বছর অভাব। কখনো আকাল, দুর্ভিক্ষ। প্রবল খরা কিংবা বন্যা। এর বাইরে তো এ গাঁয়ে বড় রকমের কিছু ঘটেনি। তাছাড়া প্রাকৃতিক কিছু হলে বুড়ি টের পায়। শুধু দৃষ্টিতে নয়, ইন্দ্রিয়েও টের পায়। এ ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই।

খেয়ে উঠে সলীম চলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে বুড়ির মনে হয় সলীম বেশ একটা পুরুষ হয়েছে। ছেলে-ছোকড়া ভাবটা ওর মধ্যে এখন কম। আর কিছুদিনে সেটাও ঝরে যাবে। কলীম খেয়ে উঠতে যাবে তখন ওকে ধরে বসে বুড়ি।

– হ্যাঁ রে বাবা কি হয়েছে দেশটার? জন্মাবার পর থেকে তো কিছু হতে দেখলাম না।

– কোন দিন হয়নি বলে কি এখন হবে না মা?

– তা বলবি তো কি হয়েছে?

– সে মেলা কথা তুমি বুঝবে না মা।

– তোদের মুখে এই এক কথা। বুঝবো না কি? বোঝালেই বুঝবো।

রমিজা পাশ থেকে চট করে বলে, আমাদের বোঝাবে কি আম্মা কলীম ভাই নিজেই জানে না কি হয়েছে।

– হ্যাঁ, জানি না তোমাকে বলেছে। দেখ এবার আমাদের একটা যুদ্ধ করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে।

– ওমা এ আবার কি কথা? স্বাধীন আবার কি রে?

বুড়ি চোখ গোল করে তাকায়। সুযোগটা নেয় কলীম।

— এজন্যে তো বললাম কিছু বুঝবে না।

— যত্তসব আজগুবি কথা। আসলে একটা কিছু নিয়ে থাকতে না পারলে তোমাদের দু'ভায়ের ভাল লাগে না। মাগো কত যে তোমরা পার।

রমিজা ফোঁড়ন কেটে থালাবাসন গুছিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। কলীম ওর কথার উত্তর দেয় না। বিড়ি টানবে বলে উঠোনে নামে। একটু পরে ভেসে আসে ওর কণ্ঠের গান। বুড়ি ভাবনায় পড়ে। হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে থাকে। যখন কোন সমস্যায় পড়ে তখন গফুরের কথা বেশি করে মনে হয়। দূরের অন্ধকার দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশের বুকে ফুটিফাটা জ্বলে তারারা। বাঁশবনের মাথার অন্ধকার নিবিড় হয়ে ওঠে। যুদ্ধ কি? যুদ্ধ কখনো দেখেনি বুড়ি। গফুরের সঙ্গে বিয়ের ক'দিন পর শুনেছিল দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন কোন যুদ্ধের কথাবার্তা হয়নি। গাঁয়ের লোক এমন গম্ভীর হয়ে যায়নি। সলীমের মত থমথমে আচরণ করেনি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে তখন গাঁয়ের ছেলেরা সবুজের ওপর সাদা রঙের চাঁদতারা মার্কা পতাকা নিয়ে লাফালাফি করছিল। গাছের আগায় বেঁধে দিয়েছিল। মোটকথা একটা দারুণ ধুমধাম হয়েছিল। সবার মনে ফুর্তি ছিল। কিন্তু এখন কেন স্বাধীনতা মানে যুদ্ধ? সলীম কলীম কেন এমন বদলে গেল? কি হল দেশটার? নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু। নইলে বিয়ে পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে কেন ওরা।

সূচোল হয়ে ওঠে বুড়ির ভাবনা। খরা বা বন্যার মত এ ঘটনা নয়। পুড়িয়ে বা ভাসিয়ে দিয়ে যায় না প্রকৃতি। এর সঙ্গে মানুষের যোগ আছে। সেজন্যে সলীম কলীম ভাবনায় পড়ে, তৈরী হয়। প্রস্তুতি নেয়। বুড়ির সামনে সমস্যার নতুন দিগন্ত-দুয়ার খুলে যায়। সেটা ওর মগজে ঘুরপাক খায়। সে আবর্ত ওর ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে তোলে। কি যেন গন্ধ পায় বাতাসে। ওর মনে হয় পোষা কুকুরটার ঘেউ ঘেউ শব্দও যেন কেমন। একটু অন্যরকম। চিরকালের চিরচেনা নয়। যে কোন সচেতন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক তা বুঝতে পারবে। বুড়ি হলদী গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনুভব করে হলদী গাঁয়ে চিরকালীন শান্ত সংযত কর্মপ্রবাহে জোয়ার এসেছে। মুখ বুজে সয়ে যাওয়া, ঘা খেয়ে মাথা নোয়ানো মানুষগুলোর কণ্ঠে এখন ভিন্ন সুর। চোয়ালে ভিন্ন আদলের ভঙ্গি।

বুড়ি গরু বাঁধতে এসে রমজান আলীর দিকে তাকিয়ে থমকে যায়।

— রমজান ভাই কৈ যাও?

— বাজারে। মনসুরের দোকানে ট্রানজিস্টারে খবর শুনবো। এবার সাংঘাতিক একটা কিছু হবে সলীমের মা। আমরাও ছাড়ব না।

— কি হবে রমজান ভাই?

— এখন আসি। পরে কথা হবে।

বুড়ি কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কেন এমন হল দেশটার। বাঘা আজকাল কারণ অকারণে ঘেউ ঘেউ করে। বাঁশবনে শত্রু লক্ষ্য করে দৌড়ে যায়। ফিরে এসে বুড়ির পায়ের কাছে বসে গরগর শব্দ করে। জিহ্বা বের করে লম্বা শ্বাস নেয়। বুড়ি মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

— তোর এত অস্থির লাগে কেন বাঘা? তোর কি হয়েছে? তুই কি কিছু বুঝতে পারিস? ছোটবেলা থেকে কত কিছুই যে বুঝতে চেষ্টা করেছি পারিনি। এখন আমি বুঝতে চাইরে বাঘা। আমার শরীরটা অন্য কথা বলে। আমিও ধরতে পারছিরে বাঘা, এ খরা না বন্যা নয়। এ অন্য কিছু, একদম অন্যরকম।

— আম্মা যে কি কুকুরের সঙ্গেও কথা বলে।

রমিজার কথায় বুড়ি লজ্জা পায়। সত্যি মাঝে মাঝে আশপাশের সব কিছু একদম ভুলে যায়। তখন মনে হয় নিজের মনটাই বড় সঙ্গী। নিজের সঙ্গে আপন মনে কথা বলাতেও কম সুখ না, খেলাটা জমে ওঠে। তখন আর কিছু খেয়াল করতে পারে না। আসলে বাঘাতো উপলক্ষ মাত্র।

— আম্মা আপনার কি হয়েছে? আপনিও কি ওদের মত হয়ে গেলেন?

রমিজার হাসিতে বুড়ির রাগ হয়। ওর মুখের দিকে তাকায় না। মেয়েটা ডেঁপো হচ্ছে। সব কিছুতে নাক গলাতে আসা! ওর কি দরকার শাশুড়ির দিকে এত খেয়াল করার? বুড়ি রাগের চোটে বাঘার গায়ে এক লাথি দিয়ে ওকে উঠিয়ে দেয়। তারপর রইসকে নিয়ে পুকুরঘাটে চলে যায়।

আজকাল প্রতিদিনই নতুন মনে হয় বুড়ির। সকালের আড়মোড়া ভাঙতে কোন আলস্য নেই। চমৎকার ঝরঝরে লাগে। দরজা খুললেই এক ঝলক সতেজ বাতাস ফুসফুসের মধ্য দিয়ে ঢুকে এক দৌড়ে পুরো শরীর স্নিগ্ধ করে ফেলে। বুক ভরে শ্বাস টেনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাঁস মুরগির খোঁয়াড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। একটানে দরজা খুলে দেয়। কলকলিয়ে বেরিয়ে আসে ওরা। গোয়ালে যায়। গরুটার গলায় হাত বোলায়। বাছুরটার গা চাপড়ে দেয়। সব কিছুতে এখন আনন্দ। সারাদিন কেমন করে যে কাটে টের পায় না। বাঁশবনের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকঝাঁক বালিহাঁস উড়ে যায়। উঠোনে ছায়া পড়ে। অসম্ভব সুন্দর হলুদ গলাটা সকালের রোদের মত লাগে। কোথায় যেন আলগা রঙে ঝরণা বইছে। অথচ ধরতে পারছে না বুড়ি। সে রঙ এবার বন্যা হবে। সে বন্যা নতুন পলিমাটি বয়ে আনবে। উর্বরা শ্যামল মাটিকে ঐশ্বর্যশালী করবে। বুড়ি খালের ধারে যায়। মনে হয় মৃদু-স্রোতের ছোট খালের শরীর বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পানির রেখা, জলের বুকের কেলি। বদলে যাচ্ছে সবুজ শ্যাওলার মাথা নাড়া, পারের মাটির সখী-খেলা। বদলে যাচ্ছে মাটির গভীর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দধ্বনি। কেমন যেন উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে খালের শরীর। চিরকালের চিরচেনা নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা খালটা কত দ্রুত পাল্টে গেল। যেন বাক বদলাতে চায়, যেন স্রোতে বিশাল কিছু বয়ে আনতে চায় কিংবা দু'কূল ভাসিয়ে সাগরে যেতে চায়। বুড়ি খালের পানিতে হাত ভেজায়, গালে ডলে, চোখে মাখে, মাথায় দেয়। যদি পানি তাকে কোন নতুন কথা বলে দেয়? যদি বলে কেন হলদী গাঁয়ের প্রাণ বদলে যাচ্ছে। কোন অমোঘ শক্তির টানে হলদী গাঁ তার আপন স্বরূপের বাইরে পা বাড়াচ্ছে? কে তাকে এমন সাহসী, বেগবান এবং যৌবনবতী করে তুলল?

বুড়ি স্টেশনের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোটবেলায় কতদিন জলিলের হাত ধরে ঐ রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে স্টেশনে গেছে। ঐ রাস্তার

ধুলোমাটি, লজ্জাবতী লতা, ভাটফুল, কচুপাতা, শন্সা ঘাস সব কিছুই তো ওর মুখস্থ। কোনটাকে বুড়ি না চেনে? অথচ এখন মনে হয় ঐ রাস্তাটা একদম অচেনা। কোনদিন এই পথে হাঁটেনি। এই পথে হাঁটতে দারুণ সাহস লাগে। ধুলো-ওড়ানো কাঁচা রাস্তাটা রোদের সোহাগে ঝক্‌ঝক্ করে। কেমন বুক চিতিয়ে হা হা করছে। যেন ডাকছে, এস একবার দেখে যাও। দেখ কোথায় নিয়ে যাই। কত লোক আসা-যাওয়া করছে রাস্তা দিয়ে। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। সবার পায়ের চলার গতি দুর্বার হয়ে উঠেছে। ঐ মাটির সঙ্গে মানুষগুলোর পায়ের আশ্চর্য মিল। ঐ মাটি ওদের সঙ্গে কি কথা বলে? কি মন্ত্র শিখিয়ে দেয়? ঐ রাস্তা যদি বুড়িকে বলে দিত হলদী গাঁয়ের প্রাণ কেন বদলে যাচ্ছে? এই টগবগিয়ে ওঠা প্রাণটা কে এতদিন ঘুম পাড়িয়ে দীঘির বুকে লুকিয়ে রেখেছিল? ঐ রাস্তা কেন বুড়িকে এখুনি বলে দিচ্ছে না যে হলদী গাঁর লোকগুলো কোন লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করছে?

গাঁয়ের শেষ মাথার বড় শিমুল গাছের নিচে গিয়ে বসে বুড়ি। ওখানে বসে স্কুলঘরের মাঠে ছেলেদের হৈচৈ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। ছেলেগুলোর মধ্যে সেই অকারণ ছেলেমানুষী দুষ্টুমির চপলতা নেই। ওরা যেন কেমন নতুন ঢঙে কথা বলে। ওরা কেবলই উত্তেজিত হতে থাকে। ওরা এ গাঁয়ের বেড়িটা ভেঙে দিতে চাইছে। ওদের গায়ে এখন অসুরের শক্তি। নেংটি পরা টিংটিং-এ ছেলেগুলো যে এমন দামাল হতে পারে তা বুড়ি ভাবতেই পারে না। পেট ভরে ভাত খেতে পায় না যারা ওরা আবার লড়বে কি? কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে বুড়ির মন ভরে যায়। রইসের মুখটা মনে পড়ে। রইস যদি ওদের মত এমনি করে দামাল হতে পারত? এ চঞ্চল শক্তিমান ছেলেগুলোর পাশে নিজের পঙ্গু অসহায় ছেলেটার কথা মনে করে বুড়ির বুক ভার হয়ে গেল। না, ও কোন কাজেই লাগবে না। ওকে কোথাও লাগানো যায় না। হলদী গাঁয়ের নতুন সম্ভাবনায় জেগে ওঠা প্রাণের জোয়ারে রইস অপ্রয়োজনীয়। একেবারেই তুচ্ছ। মাথার ওপর শিমুল গাছের ছায়া বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে যায়। তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা যদি বলে দিত কেন হলদী গাঁ এমন করে বদলে যাচ্ছে? কেন ওরা ডাংগুলি আর মার্বেল খেলা ছেড়ে দিয়ে বড়দের মত ভাবুক হয়ে গেছে? ওদের প্রাণে এখন কোন বাতাস বইছে? ওরা কেন বন্দুক ছোড়া শিখতে চাইছে? কোন বন্দি দেশের রাজপুত্র হয়ে গেল ওরা? কোন সাম্রাজ্য জয় করবে বলে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে? ওরা কি চায়? কি নেই ওদের? কোন প্রয়োজনে ওরা রক্তের হোলি খেলায় মাতবে? উঠতে গিয়েও বসে পড়ে আবার। উঠতে ভাল লাগছে না। এ জায়গাটা খুব প্রিয় বুড়ির। এখানে বসে হলদী গাঁকে বড় আপন করে দেখা যায়। যে দেখায় উপরের খোলস ঝরে গিয়ে ভেতরের প্রাণ ঝলমলিয়ে ওঠে। অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য, নিপীড়ন, বঞ্চনা হলদী গাঁর সমৃদ্ধ প্রাণকে জীর্ণ মলিন করে রেখেছে। এ মলিনতা বুড়িকে স্পর্শ করে যায়। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে চারদিকে। ফাগুনের গুমোট গরম কখনো হঠাৎ করে উবে যায়। তখন বেশ লাগে। বাড়ির আশপাশে অনেক পাখি ওড়ে। দূরের গাছে হলুদ বউ কথা কও এক মনে ডাকে। এক ঝাঁক পরাণচমকানি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে।

হঠাৎ মনে হয় শিমুলের গোটা আচমকা ফেটে গিয়ে যেমন তুলোগুলো দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে তেমনি হয়েছে হলদী গাঁয়ের অবস্থা। গাঁয়ের মানুষগুলোর বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা শিমুল বীজ ফাগুনের গরম বাতাসে আচমকা ফেটে গেছে। মানুষগুলো ছুটছে ছুটছে একটা লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য ঐ শিমুল তুলোর মত সাদা ধবধবে উজ্জ্বল। শিমুলের লাল ফুলের বীজ থেকে যেমন ঐ উজ্জ্বলতার জন্ম হয় এও তেমনি। রক্তলাল ফুলের মত মানুষগুলোর চেহারা এখন রক্তাভ। কেবল ফোটার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। বুড়ির বুক যেন কেমন করে। মানুষগুলোর মুখের আশনাই বুকের মধ্যে তুলোর মত হালকা ধবধবে সাদা হয়ে যায়। বুড়ি ছটফট করে। ওরা কেন কেউ কিছু বলছে না ওকে? কি যে হচ্ছে সারা গাঁ জুড়ে? বাহিরের ডবকা ছেলেগুলো সামনে গেলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, তোমাদের মতো বুড়োদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। এ এক কঠিন সময়।

– আমি কোন কাজেই লাগব না?

– না, গো, না। কিছু পারবে না।

বড় বেশি সাহসের কথা বলে যুবকরা। বুড়োদের বাদ দিয়ে দিতে চায়। নেংটি পরা ছেলেদের কি এত কিছু মানায়? রমজান আলীকে ধরে বসে ও।

– কি হচ্ছে রমজান ভাই বলতো?

– সে তুমি বুঝবে না। যারা এতকাল আমাদেরটা খেয়েছে এবার আমরা তাদের দেখে নেব। আর চুপ করে থাকব না।

– পারবে?

বুড়ি চোখ বড় করে তাকায়।

– কেন পারব না? দেখছ না আমাদের ছেলেরা তৈরি হচ্ছে?

– নেংটি পরা ছেলেদের কি এত কিছু মানায়?

বুড়ির কথায় হো-হো করে হেসে ফেলে রমজান আলী।

– ভালই বলেছ সলীমের মা। মানায় না মনে করেই তো আমরাও এতকাল চুপ ছিলাম। আর তো পারি না। ওরা উঠতে উঠতে আমাদের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেছে।

– কি যে বল বুঝি না?

– বুঝবে না। ঘরে যাও। মাথা ঠাণ্ডা কর।

রমজান আলী সোজা রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে যায়। বুড়ি ঘরে ফেরে।

ওদের কথা বিশ্বাস হয় না বুড়ির। সলীমের কাছে জিজ্ঞেস করে। সলীম গম্ভীর, ভাবনায় মগ্ন। বুড়িকে কিছু বলে না। বুড়ির যেন এ গাঁয়ের সারিতে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। অথচ বুড়ির সেই নিরেট মনটা অনবরত এক লক্ষ্য আবিষ্কারে তৎপর।

বুড়ি কাচারী ঘরের বাঁশের বেড়ার পাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের কথা শোনার চেষ্টা করে। সলীমের কণ্ঠ উত্তেজনায় গমগম করে। ওরা কি যেন বলাবলি করে। কিছু বুঝতে পারে না বুড়ি। তবুও মনে হয় ও নিজেও যেন নিজেকে প্রস্তুত করছে। একটা কিছু ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি। যে ঘটনা বুড়ি কোনদিন

দেখেনি এবং আর কোন দিন দেখবেও না। সেই যে বাইশে ফাগুন রেডিওতে একটা বক্তৃতা হয়েছিল সলীম ওকে ডেকে তা শুনিয়েছিল। বলেছিল, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কি দরাজ গলা! সেই কণ্ঠস্বর এখনো গমগম করে হলদী গাঁ জুড়ে। বুড়ি সকলের সঙ্গে অভিভূতের মত শুনেছিল। শুধু এটুকু বুঝেছিল যে একটি মানুষ ওদের সকলের হয়ে কথা বলছে। একদম ওদের হৃদয়ের কথা। হলদী গাঁর মাঠ, ক্ষেত-ফসল, গাছগাছালি, গরু-ছাগল, পাখ-পাখালি এবং মানুষের কথা। সিরাজ মিয়া কথাগুলো ধরে রেখেছে একটা যন্ত্রে। তারপর থেকে সেই কথাগুলো ওরা প্রায়ই শোনে। শুনতে শুনতে ওদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সলীম মুখস্থ করে ফেলেছে কথাগুলো। খুব বেশি কিছু না বুঝলেও দুটো লাইন বুড়ির মনে সারাক্ষণ মাতামাতি করে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বুড়ির এর বেশি কিছু মনে থাকে না। সলীমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সলীম বলে দেয়। আবার ভুলে যায় ও। কিন্তু কানের পর্দে রেশ জেগে থাকে সব সময়। তাতে বুড়ি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং সে সূত্র ধরে বুড়ি আরো অনেক কিছু বুঝে উঠতে চেষ্টা করে। সেই বজ্রকণ্ঠের মানুষটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে বুড়ির।

একদিন সলীমকে ধরে বসে, বঙ্গবন্ধুকে আমাকে একদিন দেখাবি বাবা?

সলীম হেসে ফেলে।

– কেমন করে? ঢাকা অনেক দূরের পথ। তাছাড়া আমিও তো দেখিনি তাঁকে। কেবল মনে মনে একটা মুখ বানিয়ে নিই।

– আমিও বানাই সলীম।

বুড়ি উৎসাহ ভরে বলে।

– কিন্তু দেখিনি বলে এক একবার এক একরকম হয়ে যায় রে।

– ঠিকই বলেছ। যেবার গঞ্জে এলো বক্তৃতা করতে ওখানে যেতে পারলাম না অসুখ ছিল বলে। আর বুঝি দেখা হবে না?

– হবেরে হবে। বেঁচে থাকলে ঠিকই হবে।

বুড়ির উৎসাহে ভাটা পড়ে না। হলদী গাঁর এখানে সেখানে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে সলীমের বৌ-র পাশে এসে বসে। আজকাল সলীম রমিজাকে আর মারে না। রমিজার বাচ্চা হবে। ও মা হবে। বুড়ি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বুড়ির মত সাধনা করতে হয়নি ওকে, অনায়াসে মা হয়ে যাচ্ছে। রমিজার মেজাজ আজকাল খুব ভাল। অনায়াসে মা হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু পেতে যাচ্ছে এ বোধ ওকে সুখ দেয়। বুড়ি ওর পরিতৃপ্ত মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ওকে এখন ভীষণ ভাল লাগে বুড়ির। রমিজার পাশে এসে বসলে ও সস্নেহে বুড়ির দিকে তাকায়।

– আম্মা আপনার কি হয়েছে? মুখ একদম শুকিয়ে গেছে।

– রোদে ঘুরেছি কিনা তাই অমন দেখায়। সত্যি সারা গাঁয়ে যেন কি হয়েছে রমিজা?

– কি আবার হবে? আপনাকেও ওদের ভূতে পেয়েছে।

রমিজা খুকখুক করে হাসে। ওর হাসির একটা ঢঙ আছে।

হাসতেই থাকে রমিজা ওর এই হাসি সলীম সহ্য করতে পারে না। রেগে যায়

– হাসিস না রমিজা। হাসির কথা নয়।

– আমার অতশত ভাবনা নেই আম্মা তাই হাসি। এ বাড়ির সবাই যেমন গম্ভীর হয়ে গেছে তাই আমি একাই হাসি। রইস আমার হাতে দুধ খায়নি। সে কি রাগ কিছুতেই খাবে না। আপনার জন্য বসে রয়েছে।

রইস-রইস-রইস।

বুড়ির ছেলের কথা মনে হয়। এই ছেলের জন্যে বুড়ির কত আকাঙ্ক্ষা ছিল। এক সময় ছেলের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। আজ আর তড়িঘড়ি করে ছেলের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল না। বেশ কিছু দিন ধরে রইসের দিকে তেমন খেয়াল দিচ্ছে না। ও একা একা ঘুরে বেড়ায়, নয় বারান্দায় বসে থাকে কিংবা উঠোনে বাঘার সঙ্গে খেলা করে। যেহেতু রইস কথা বলতে পারে না তাই ওর কোন অভিযোগ নেই। বুড়ির অবহেলা ও নীরবে মেনে নেয় কিংবা বুড়ির আদর সোহাগও নীরবে উপভোগ করে। রইস একদম একলা। কারো সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ নেই। বুড়ি হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপচাপ রমিজার পাশে বসে রইল। বৃষ্টিবাদলা না থাকলে রমিজা উঠোনের চুলোয় রান্নাবাড়ি করে। রান্নাঘরের চাইতে বাইরে রাঁধতেই নাকি ওর ভাল লাগে। রমিজা গনগনে আগুনে ভাত ফোটায়। শুকনো পাতা দাউদাউ জ্বলে, বাতাসে সেটা আরো দপদপিয়ে ওঠে। বুড়ি একদৃষ্টে আগুন দেখে। টগবগ করে ফুটে ওঠা ভাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবনা এসে জড়ো হয়। হলদী গাঁও তো এমন টগবগ করে ফুটছে। আগুন দিল কে? এ আগুনে কোন পাতিলের ভাত সেদ্ধ হবে?

ফাগুন শেষে চোত এল। চোত মানেই তো সূর্যের আগুনে খেলা। খাঁ-খাঁ করে গাঁয়ের বুক। মাটি বড্ড চড়া, রোদের তাপে পা ফেলা যায় না। বুড়ি এখন বেশি বেরুতে পারে না। বেরুলে গায়ে আগুনে-বাতাসের হলকা লাগে। পায়ের নিচে ঠোসকা পড়ে। কেমন হাঁফ ধরে যায়। খালের পানি চিকচিক করে। ও রমিজার সঙ্গে গল্প করে।

জানিস রমিজা আমার জীবনে হলদী গাঁ-কে এমন গরম কোন দিন দেখিনি রোদ তো নয় যেন গনগনে আগুনের হাঁপরের মুখটা কে খুলে দিয়ে রেখেছে। বাইরে বেরুনোর জো নেই।

– আপনি এত ঘোরাঘুরি করবেন না আম্মা। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে আপনার শরীর কেমন হয়ে গেছে। শেষে একটা অসুখ না বাধলে বাঁচি। কাল থেকে যেন আপনাকে বাইরে না দেখি।

– তা কি হয়? ঘুরতে আমার মন চায় রে। দেখিস না ওরা কেমন মেতে উঠেছে।

– থাক, ওরা মাতুক। আপনার দরকার নেই।

রমিজা বুড়িকে ছোট মেয়ের মতো শাসন করে।

– না রে রমিজা এমন কথা বলিস না। ওরা যখন 'জয় বাংলা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে মনে হয় আমার প্রাণটা ধরে কে যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল। এমন ডাক আর হয় না রমিজা। রমিজারে তুই অনেক কিছু বুঝিস না। জয় আমরা চিৎকার করে বলি, জয় বাংলা।

রমিজা হাঁ করে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ির মুখ যেন এক পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

– জানিস রমিজা সবকিছু ভুলে যাই কিন্তু এই ডাকটা আমি ভুলি না। কখনো ভুলি না। ভুলতে আমি পারি না। কেন এমন হয় বল তো?

– আমি জানি না আম্মা।

– আমি দেখি রে এই ডাক হলদী গাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমার এত বছরের জীবনে আর কোন ডাকে হলদী গাঁয়ে এমন জোয়ার দেখিনি রমিজা। আহা কি যে ভাল লাগে। মনে হয় মরে যাই। এখন মরে গেলে আর কোন দুঃখ নাই।

– আম্মা আপনি এত ভাবেন কেন?

বুড়ি ওর সঙ্গে আর কোন কথা বলে না। নিজের মধ্যে ডুবে যায়। রমিজা শান্ত চুপচাপ মেয়ে। এতসব হট্টগোল পছন্দ করে না। তাছাড়া ওর শরীরও ভাল নেই। ভেতরের প্রাণের লক্ষণ ছটফটিয়ে বাড়ছে। ও রমিজাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। বুড়ি আকাশ দেখে। রমিজা বলে ভাবেন কেন? এতসব কর্মকাণ্ডের ভেতর থেকে কেউ কি না ভেবে পারে? চৈত্রের আকাশ উজ্জ্বল নীল। বাঁশবনে ছাতার পাখি ডাকে। সেটা থামলে কুটুম পাখি ডেকে ওঠে। বুড়ি কান পেতে শোনে।

– কুটুম পাখি ডাকে রমিজা?

– নির্ঘাৎ আমার বাপের বাড়ির লোক আসবে। উঃ কতদিন যে বাবাকে দেখিনি। ছোট বোন দুটো এলে আরো ভাল হয়। ওরা আমাকে যা ভালবাসতো। আমাকে ছাড়া ওদের এক মুহূর্ত চলতো না। সারাক্ষণ আমার পিছে পিছে ঘুরতো।

রমিজার খুশিভরা মুখ চেয়ে দেখে বুড়ি। বাবার বাড়ির কথা শুনলে রমিজার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও তখন অন্য এক জগতে চলে যায়। বাবার বাড়ির স্বাদ বুড়ি পায়নি। ওর কাছে শ্বশুর বাড়িও যা বাবার বাড়িও তা ছিল। বুড়ির মনে হয় মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। গফুর কবে মরে গেছে সেই স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে এসেছে। সলীম কলীম কোনদিন ছোট ছিল কি না তাও আজ আর মনে নেই। ঝিমুনি আসে। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর ঘুমের আমেজ ঘনিয়ে আনে। দাওয়ার ওপর রমিজা ঘুমিয়ে গেছে, রইস ঘরে। সলীম কলীম এখনো ফেরেনি। বেলা গড়িয়ে যায়। ওরা ফেরেনি বলে কেউ দুপুরের ভাতও খায়নি। রমিজাকে খেতে বলেছিল বুড়ি। ও খায়নি। সলীমের আগে ও খায় না। ওদের অপেক্ষায় বসে থাকে বুড়ি। বাঁশের খুঁটিটার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে। শুলে ঘুম এসে যেতে পারে। বারেবারে তন্দ্রা ছুটে যায়। মনে হয় কলীম যেন উঠোনের মাথা থেকেই চিৎকার করছে। বলছে, মা ভাত দাও। ওর যেন তর সইছে না। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। কলীম ভীষণ ক্ষুধার্ত। বুড়ি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। চোখ খুলে দেখে কেউ কোথাও নেই।

বুড়ি বিহ্বল হয়ে যায়। কে ডাকে অমন মা মা করে? কার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে মা ডাকের জন্যে? কে অমন চিৎকার করে ভাত চায়? বুড়ি কান খাড়া করে চেয়ে থাকে। পুরো হলদী গাঁ যেন চিৎকার করছে ভাতের জন্যে। আকালে, বন্যায়, খরায় এমন চিৎকার ও অনেক শুনেছে। শুধু তাই নয় এমন চিৎকার ও অহরহ শোনে। এই

চিৎকারই হলদী গাঁর নিয়তি। চিৎকার করতে করতে হলদী গাঁর লোকগুলোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে। বুড়ির অস্থির লাগে। মনে হয় কতগুলো শব্দে ওর চারপাশটা গমগম করছে, মা ভাত দাও— মা ভাত দাও। ভাত দাও—ভাত দাও—ভাত দাও। অন্তর ছটফট করে।

বুড়ি উঠোনে নেমে আসে। কাচারীঘর ফাঁকা। সামনে এসে দাঁড়ায়। রাস্তা বরাবর যতদূর চোখ যায় চেয়ে থাকে। কেউ কোথায়ও নেই। মাঠের ধারে গরু বাঁধা। দু'একটা ছাগল চরে বেড়ায়। বুড়ি আরো একটু এগিয়ে বড় জলপাই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পুরোনো প্রকাণ্ড গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেন বিরাট একটা সরাইখানা। যে কেউ এসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিতে পারে। সেখানে দাঁড়িয়েও বুড়ি আপ্রাণ চেষ্টা করে লোক দেখার। না কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ করে হলদী গাঁ যেন জনমানব শূন্য নিঝুমপুরী হয়ে গেছে। সব লোকগুলো কোথায় গেল? বুড়ি বাঁশবাগান থেকে গরুটা খুলে বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই গরুটা বিয়োবে। রমিজা ঘুম থেকে উঠে চুপচাপ বসে থাকে। রইসও বারান্দায় এসে বসেছে।

— কেউ ফিরেনি আম্মা?

— নারে। তোর আর না খেয়ে থাকা ঠিক না। চল আমরা খেয়ে নিই।

রান্নাঘরে বসে তিনজনে ভাত খায়। সাদা ফকফকে ভাতের দলা হঠাৎ করে বুড়ির কাছে কেমন শক্ত মনে হয়। বারবার পানি খায়।

— কি হলো আম্মা?

— খেতে মন লাগে না রে।

বুড়ি ভাত নাড়াচাড়া করে। রইস গপগপিয়ে খায়। ওর পেটে ভীষণ ক্ষিদে। বুড়ি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যায় সলীম কলীম ফিরে আসে। দু'জনের মুখ শুকনো। সারাদিন কিছু খায়নি।

— কোথায় ছিলি তোরা?

— মিটিং শুনতে গিয়েছিলাম।

সলীমের সংক্ষিপ্ত উত্তর। বুড়ি দু'জনকে ভাত বেড়ে দেয়। খেয়েদেয়ে বারান্দায় বসে ওরা। সারাদিনের ক্লান্তিতে হঠাৎ করে ঘুম আসে না। রমিজা রান্নাঘরে থালাবাসন গোছগাছ করে। বাঁশবাগানের মাথার ওপরের গোল চাঁদ থেকে আলো চুঁইয়ে পড়ছে। বুড়ির মনে হয় কি সুন্দর রাত। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। কোনদিন হলদী গাঁকে এমন মোহনীয় মনে হয়নি ওর। ওর ইচ্ছে করছে এমন চাঁদের আলোয় মাঠঘাট প্রান্তর একবার ঘুরে আসতে। আহা কি সুন্দর এই হলদী গাঁ।

— ইচ্ছে করে ডাক ছেড়ে বুক ফাটিয়ে গান গাই।

গা না কলীম?

বুড়ি উৎসাহ দেখায়।

কিন্তু তেমন করে আসছে না মা?

কলীম উঠোনে পায়চারি করে। খিঁড়ি ধরায়। বাঘার পিঠ চাপড়ে দেয়। রমিজা এসে ওদের কাছে বসে। সারা দুপুর ঘুমিয়েছে বলে রইসেরও ঘুম নাই। ও বুড়ির পিঠের সঙ্গে মিশে বসে আছে।

— আজকের রাতটা কি যে সুন্দর!

চুপচাপ থাকা সলীমও এইটুকু না বলে পারে না। নারকেল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কলীম গুনগুনিয়ে গান গায়। কখনো কিছু শব্দ জোরে উঠে আসে। আবার নেমে যায় কণ্ঠ। সলীম বসেই থাকে। আজ ওর ঘুম পায় না। রমিজা হাই তোলে না। ওরও ঘুম পায়নি। আর বুড়ির চোখ থেকে তো ঘুম পালিয়েছে। এক সময় রইসও উঠোনে নেমে যায়। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বাড়ির সামনের জামরুল গাছ পর্যন্ত হেঁটে আসে। বাঘা ওর পিছু পিছু ঘোরে। বুড়ির পরিবারের সবাই আজ ভরা পূর্ণিমা সাক্ষী করে কিছুটা এলোমেলো, কিছুটা উদভ্রান্ত সময় কাটায়।

চৈত মাসের দশ তারিখে ওদের কমদামী ট্রানজিস্টারে করে ঢাকার খবর এলো। মিলিটারি নেমেছে ঢাকার রাজপথে। তখন চৈত্রের আকাশ মুঠো মুঠো রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঠেঘাটে। রমিজা গরম ভাত নামিয়েছে চুলো থেকে। আর সলীম চেঁচাচ্ছে। একটি অখ্যাত, অবজ্ঞাত ছোট্ট গ্রাম হলদী গাঁয়ের সলীম চিৎকার করছে ক্ষোভে, আক্রোশে। বুড়িকে ধরে ঝাঁকুনি দেয় কয়েকটা। শপথ নেয় অদ্ভুত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। বুড়ি কেবল অবাক হয়ে তাকায়। কোন কিছু বোঝার ক্ষমতা ওর নেইও। যে ছেলে মাকে কোনদিন পাত্তা দেয়নি সে ছেলে আজ মা-কে ধরে চেঁচাচ্ছে। বৌ-কে, এমনকি ওর পেটের সন্তানকে সাক্ষী করে কেমন শক্ত শক্ত কথা বলছে এক প্রত্যয়নিষ্ঠ আবেগে। বুড়ির মুখ থেকে কোরানের আয়াতগুলো যেন ভক্তি সহকারে নিঃসৃত হয় সলীমের কণ্ঠ তেমনি ভক্তিতে, আবেগে, শপথে গমগম করছে। সলীমের এ চেহারা বুড়ি কোনদিন দেখেনি। সলীমকে অনেকদিন রাগতে দেখেছে কিন্তু সে রাগের সঙ্গে এ রাগের অনেক তফাৎ। এ বিক্ষোভ যেন অন্য কিছু, অন্যরকম। সলীম যেন সামনে শত্রু রেখে রুদ্র আক্রোশে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। একসময় ট্রানজিস্টার বন্ধ করে কোথায় যেন ছুটে বেরিয়ে যায়। কলীমকেও সঙ্গে নেয়। ওদের কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয় রমিজা। পেটের ভেতর শত্রুটা নড়াচড়া করে। বেচারীর ভরা মাস। শরীর ভাল নেই। মেজাজ খিঁচড়ে থাকে।

যতসব আজগুবী কাজবাজ। কোথায় ঢাকায় কি হলো তার দেখা নেই। ওনারা এখানে চিৎকার শুরু করলেন।

রমিজা গজগজ করে ভাতের হাঁড়ি শিকার ওপর উঠিয়ে রাখে। আড়চোখে বুড়ির দিকে তাকায়।

— ও আম্মা আপনার কি হলো?

বুড়ি উত্তর দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে। জয় বাংলা শব্দটা উথাল পাতাল করে বুড়ির শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সলীম কলীম ঐ ডাক ডাকতে ডাকতেই বেরিয়ে গেছে। এখন সেই শব্দ দুটো বুড়িকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রেখেছে। হাত পা কেমন অবশ লাগে। হাঁ করে রমিজার দিকে তাকিয়ে থাকে।

— দেখছেন কি আম্মা? ও আম্মা?

— রমিজা আয় আমরা ওদের মত 'জয় বাংলা' বলে হাঁক দিয়ে উঠি।

— তাতে কি হবে?

— আহ্ রমিজা তুই কিছু বুঝিস না, বুঝতেও চাস না।

— সেই ভাল বাপু, অতশত আমার সয় না।

বুড়ি দাওয়া থেকে নেমে আসে। ইচ্ছে করে সবার মত সারা গাঁ মাতিয়ে তুলতে। জলপাই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। গাছের সঙ্গে কথা বলে— জলপাই গাছ সবাই বলে আমি কোন কাজে লাগব না। কেন লাগব না? লাগালেই লাগতে পারি। আমার ইচ্ছে করে কিছু করতে। হলদী গাঁ আমার বড় প্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই তো এর ঘাস-লতাপাতা, ধুলোমাটি, জলকাদা আর লেংটিপরা মানুষগুলো আমার আপন হয়ে আছে। জলপাই গাছ- আমার বড় সাধ হলদী গাঁর জন্যে আমি মরে যাই। মরে গিয়ে হলদী গাঁকে বলি, হলদী গাঁ তোর জন্যে, শুধু তোর জন্যে আমার পরাণটুকু দিলাম। এ পরাণ আমি আর কারো জন্যে রাখিনিরে। এটা তোরই।

বুড়ির বিড়বিড়ানি থেমে যায়। দূরের মাঠে ছেলেরা জটলা করছে। এতদূর থেকে কথা শোনা যায় না। বাতাসে কান পেতে রাখে। যদি কিছু ভেসে আসে। বুড়ির গলার কাছটা শুকিয়ে এসেছে। শুকনো বুকের আবেগ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মাথার উপর কুটুম পাখি ডাকে। ঝরা পাতা মচমচিয়ে বেজি ছুটে পালায়। কোন কিছুতেই বুড়ির খেয়াল নেই।

দিন সাতেকের মধ্যে পোড় খাওয়া মানুষ হয়ে ফিরে আসে জলিল। সবাই গোল হয়ে ওর কাছ থেকে ঢাকার খবর শোনে। ওর বৌ আর মেয়ে দুটো মারা গেছে। সেই শোকে দিশেহারা। তবু জলিলের পেশি-বহুল পেটানো শরীরটা শক্ত হয়ে ওঠে।

— আমাদের এর প্রতিশোধ নিতে হবে সলীম। আমরাও ছেড়ে দেব না।

— হ্যাঁ ঠিকই, প্রতিশোধ চাই। রক্তের বদলে রক্ত।

বুড়ি বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে শোনে। সবাই চলে গেলে জলিল এসে বসে বুড়ির দাওয়ায়। ওকে এখন চেনা যায় না। অনেক বদলে গেছে। মাথার চুল অর্ধেকের বেশি সাদা হয়েছে। বুড়িকে দেখেই জলিলের আবেগ কেঁপে ওঠে। স্খলিত কণ্ঠে এলোমেলো কথা বলে।

সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে রাতের আঁধারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। আগুন। গুলি। দাউদাউ করে জ্বলে চারদিকে। মানুষ চিল্লায়। আমি বাড়ি ছিলাম না। গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ। বাবুবাজার বস্তি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পুড়ে মরলো। সব আমারে বললো পাশের ঘরের তাহের। ওরও কেউ বাঁচেনি। ও একলা পালিয়েছে।

জলিলের চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল গড়ায়। বুড়িও কাঁদে।

— আমি এমনটা দেখি নি বুড়ি। মানুষ মানুষকে এমন করে মারে কি করে? উঃ আল্লা ওদের প্রাণে কি মায়াদয়া নাই? চোখ বন্ধ করলে আমি আগুন দেখি। গুলির শব্দ শুনি। মানুষের চিল্লানিতে কান ফেটে যেতে চায়। বুড়ি আমার ঘুম আসে না।

জলিলের মুখের শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুড়ি নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকে। এক সময় থেমে থেমে বলে, যারা আমাদের ওপর গুলি চালালো তারাতো আমাদের দেশেরই মানুষ জলিল ভাই?

– হ্যাঁ আমরা তো একদেশেরই মানুষ। দেশটাতো পাকিস্তান। অন্য নাম তো শুনিনি।

– তাহলে ওরা আমাদের মারে কেন? ওরা কি আমাদের ভালবাসে না?

বুড়ির কণ্ঠ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জলিল চুপ করে থাকে। এর উত্তর ও জানে না। বুড়ির কথা নিজেও ভেবে দেখে

বুড়ি আবার বলে, আমাদের জন্যে যাদের মায়া নেই তাদের জন্যে আমাদের মায়া কি জলিল ভাই?

– ঠিক বলেছো। এ জন্যেই তো আমরা আলাদা হব। একথাই তো সবাই বলে, আমি কেবল বুঝতে পারি না।

জলিল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

– ভেবেছিলাম শোধ নেব। দেশের জন্য লড়ব। আমি যাই বুড়ি।

জলিল দ্রুত পায়ে নেমে যায়। সলীমাকে খোঁজে। বুড়ি বসেই থাকে। ওর কাছে এখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে সব বুঝে ফেলে। আগুন মানেই কেবল রমিজার ভাত রাঁধা নয়, আগুন আরো অন্য কিছু। গুলি শব্দটাও বুড়ির অভিজ্ঞতায় নতুন করে সংযোজিত হয়। গুলি দিয়ে পাখি শিকার করতে দেখেছে বুড়ি। কিন্তু মানুষ মারতে দেখেনি। বুড়ি বিড়বিড় করে, ঐ গুলিটা যখন আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে তখন ওদের শরীরে ঢুকবে না কেন? বুড়ি সাহসী হয়ে ওঠে। আমাদের ছেলেরাও তো ওটা পাল্টা ছোড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বুড়ি উঠে প্রিয় জলপাই গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে গাঁয়ের অনেক কিছু দেখা যায়। দেখতে পায় মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে জলিল।

চৈত্রের শেষে রমিজার ছেলে। হয়। ফুটফুটে ছেলে। বেশ বড়সড়। অবিকল গফুরের মত। বুড়ির কাজ বাড়ে। সারাক্ষণ নাতি নিয়ে মেতে থাকে। কাজল পরায়, তেল মাখায়। গা চকচক করে। ওকে নিয়ে গান গায়। বুড়ির প্রাণের রুদ্ধ দুয়োর যেন খুলে গেছে। এ ছেলে কি করবে, কোথায় রাখবে বুঝতে পারে না। রমিজা বুড়ির কাণ্ড দেখে হাসে।

– আম্মার খুশি যেন আর ধরে না।

গর্বিত মায়ের স্বর রমিজার কণ্ঠে। বুড়ি রমিজাকে দেখে। খুশিতে ওর মুখটা চকচক করে।

– কি দেখেন আম্মা?

– দেখি তোকে। রইস হওয়ার পর আমি তোর মত সুখ পাইনি রমিজা।

– ঐ দেখ কোথা থেকে কি কথা।

রমিজা তাড়াতাড়ি পুকুর ঘাটে চলে যায়। বুড়ি বাঘার গায়ে থাপ্পড় দেয়, ঐ বাঘা তোর খুশি লাগছে না? আমাদের ঘরে একজন নতুন মানুষ এসেছে।

যত দিন যায় নাতিকে কেন্দ্র করে বুড়ির আবেগ তরতরিয়ে বাড়ে। ছেলেকে দোলাতে দোলাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। ও রইসের মত নয়। ও হাসে, তাকায়, মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে। যখন বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলে তখন বুড়ি বুকের ভেতর জমানো সব দুঃখের কথা ভুলে যায়। ওর সঙ্গে কথা বলে, ও দাদু, দাদুরে তুই আমার সাত রাজার ধন। বুকের মানিক। তুই এমন একটা সময়ে এলি! এটা এখন জয় বাংলার সময়রে। দেখছিস না চারদিকের বাতাসে উথাল-পাথাল ঢেউ। দাদুরে তুই জানতেও পারিস না যে তোর বাপের বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন। হলদী গাঁ এখন গায়ের চামড়ার বদল ঘটাবে বলে তৈরি হয়ে উঠেছে। ও দাদু, দাদুরে তুই যখন বড় হবি দেখবি হলদী গাঁ আর হলদী গাঁ নেই। হলদী গাঁ বদলে গেছে। যারা ভায়ের বুকে গুলি চালায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকি না রে।

বুড়ি নাতিকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। পরক্ষণে সলীমের ওপর রেগে ওঠে। সারাদিন ওর কাজ আর কাজ। কি যে এত কাজ?

বুড়ি একদিন বলেছিল, হ্যাঁ রে বাপ হয়ে ছেলেটাকে তো একদিন ভাল করে দেখলিও না? এ কেমন কথা?

ধুত ঐ মুরগির বাচ্চা আমি দেখব কি? তুমি দেখ। বড় হোক তখন ও আমার।

বুড়ির অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

— কি দেখছ কি? আচ্ছা মা তুমি যে ওকে কোলে নিতে বল তা কি আমি পারি? হাতের ফাঁক দিয়ে তো পড়ে যাবে। তাছাড়া আমার সময় কৈ ছেলে সোহাগ করার? আমার কত কাজ।

— ঐ কাজ নিয়েই তুই থাক। বড় হলেও ছেলে তুই পাবি না।

— আচ্ছা দিও না। শোন মা, ও যাতে একটা স্বাধীন দেশের মাটিতে বড় হতে পারে সেই প্রতিজ্ঞাই তো আমি নিয়েছি। বড় হয়ে ও গর্ব করতে পারবে যে ওর বাপ একটা নতুন দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছিল। আমার ছেলের বুকের মধ্যে এই অহংকারের বীজ আমি পুঁতে দিতে চাই মা। এটাই আমার সোহাগ। তুমি ওকে এখন সোহাগ কর ও যাতে বড় হয়। মানুষ হয়।

সলীম হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। কথাগুলো বুড়ির বড় ভাল লাগে। কথাগুলো বুকের কৌটো খুলে তার মধ্যে জমিয়ে রাখে। দুঃসময়ে এসব কথা ভীষণ কাজ দেয়। বুড়ির দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

রইস মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বাচ্চাকে দেখে। কি যেন এক বিস্ময় ওর চোখের সামনে। এত ছোট বাচ্চা এত কাছ থেকে ও আর কখনো দেখেনি। হাত পা নেড়েচেড়ে মাঝে মাঝে বিরূপ হয়ে যায়। মারতে ওঠে। রইসের ভয়ে নাতিকে সারাক্ষণ আগলে রাখে বুড়ি। ও কখন কি অঘটন করে ফেলে বলা যায় না। নাতিকে নিয়ে বুড়ির সময় চমৎকার কাটে। সলীম কলীম বেশির ভাগ সময় বাড়ি থাকে না। কখনো বা রাতেও ফেরে না। রমিজা সাংসারিক ঝামেলায় ছেলের দিকে নজর দিতে পারে না। ফলে নাতির সব দায় দায়িত্ব বুড়ির একলার। ও একটা ছোট্ট দেশ। বুড়ি ঐ দেশের মালিক। ঐ দেশে আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই। দুপুরের কড়া রোদে বাইরে যখন ঘুঘু

ডাকে তখন বুড়ির অন্তর আর শূন্য হয়ে যায় না। রমিজার ছেলে সরোবরে নীল পদ্ম হয়ে অনবরত গন্ধ ছড়ায়। প্রশান্তির আলো হয়ে জ্বলে বুড়ির মন নামক সমুদ্রের বাতিঘরে। ভাবনার পাখিগুলো সে বাতিঘরের চারপাশে বারবার ভিড় জমায় আশ্রয়ের আশায়। নাতির চিন্তায় ভালো করে ঘুমুতেও পারে না বুড়ি। যন্ত্রণা কখনো মধুর হয়ে ওঠে। বুড়ির এখন সে অবস্থা, দিনগুলো পালে বাতাস লাগা নৌকোর মত।

বৈশাখের শেষ দিকে গান গাইতে গাইতে নীতা বৈরাগিণী আসে। একলা, চরণদাস নেই। হাঁটুর কাছাকাছি শাড়ি ওঠানো। ধুলোয় ধূসরিত পা। ক্লান্ত চেহারা, শুকনো ঘাসের মত রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে। নীতাকে যেন বয়সে পেয়ে বসেছে। ওকে দেখে ঝকমকিয়ে ওঠে বুড়ির চোখ।

— সই কতদিন আসিসনি। আয় বস।

হাত ধরে নীতাকে বারান্দার ওপর এনে বসায়। ও দোতারাটা নামিয়ে রাখে একপাশে। পিঠের ওপর থেকে কাপড়ের পুটলীটাও নামায়। পা দু'খানা জড়ো করে বসে।

— নাতি বুঝি?

— হ্যাঁ।

— চাঁদের মত ছেলে।

নীতা সরল হাসি হাসে। বুকের নিচে দুম করে কিসের যেন একটা শব্দ হয়। ছেলে, স্বামী এসবের কোন বালাই নেই ওর জীবনে। বুড়ির এখানে এলে বুকটা কেন মুচড়ে ওঠে। যত বয়স বাড়ছে ততই এসব বোধ প্রবল হচ্ছে। এখন আর ওর যৌবন নেই। যৌবনের মাদকতা নেই। পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যায় নীতা। বিশ্রাম চায়, আশ্রয় চায়। দু'মুঠি ভাত চায়। নীতা হঠাৎ করে সব দুঃখবোধ একপাশে ঠেলে রেখে কোমরে গোঁজা কৌটো থেকে তামাক বের করে।

— কিরে কি ভাবছিস?

— ভাবছি তোর মত একটা সংসার পেলে ঠেলেঠুলে ঢুকে যাই।

— কি যে বলিস সংসার কি তোর ভাল লাগবে? তোর মুখে তো আগে কখনো এমন কথা শুনিনি?

— যত বয়স বাড়ছে ততই তোকে আমার হিংসে হয়।

— সব তোর বাজে কথা।

বুড়ি হেসে গড়িয়ে পড়ে। নাতিকে আদর করে। নীতার বৈরাগী মন ধূ-ধূ করে। ধূসর হয়ে যায় সামনের দিনগুলো। পেছনের দিনগুলো কত মধুময় ছিল। ঘরের চার দেয়াল কল্পনাই করতে পারত না। এখন আখড়ায় বসেও সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

— তোর মনের মানুষ কই সই?

— মনের মানুষ? মনের মানুষ ছেড়ে এসেছি। এখন এই দেশটাই মনের মানুষ। নীতা দোতরা তুলে নেয়। টুংটাং ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ও আবার নিজের ভুবনে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা অকারণ যন্ত্রণা পায়।

ও গান ধরে :

সোনার গাঁয়ে বসত করি

সোনা মারেই জানি

বাংলা মায়ের কথা কইয়া

জুড়াইতো পরাণী

মায়ের কোলে দুধের শিশু

আদরের নাই শেষ

আমার সোনার বাংলাদেশ।

বুড়ি মনোযোগ দিয়ে গান শোনে। সলীম কলীমের কথা মনে হয়। ওরাও ঠিক এই বলে। নীতার কণ্ঠ বুড়ির অন্তর ছুঁয়ে সারা গাঁয়ে ভেসে চলে যায়। বাঁশবনে, খালের ধারে, স্টেশনের রাস্তায়, শিমুল গাছের মাথায় একটা ছোট বলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যায়; বাতাসের সঙ্গে তার সব ভাব। বুড়ি অভিভূত হয়। নীতাকে বড় আপন, বড় কাছের মনে হয়। ও এখন কেবল মনের মানুষ খোঁজা বাউল নীতা নয়। নীতার সুখ-দুঃখ কণ্ঠের গান মিলিয়ে নীতা বুড়ির ঘরের লোক। দূরের নক্ষত্র হয়ে কেবল জ্বলে না। নীতার দোতারার টুংটাং ধ্বনি সারা বাড়িময় জেগে রয়। উঠোনে রমিজা বাঁশপাতা দিয়ে ভাত ফোটায়। মুঠো মুঠো শুকনো পাতা চুলোর মধ্যে গুঁজে দিচ্ছে। একদফা পুড়ে নিঃশেষ হবার আগেই আরেক মুঠো দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুন দেখতে দেখতে নীতার দোতারা থেমে যায়। বলে, আজ আমার যাবার তাড়া নেই সই। তোর এখানে ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে যাব। তোর ছেলেরা বাড়িতে নেই তো?

— না, তাছাড়া ওরা কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই।

— ওরা থাকলে বড় সংকোচ লাগে।

মিছামিছি লজ্জা পাস, ওরা বড় ভাল ছেলে।

কি রেঁধেছিস সই?

ধুন্দুল দিয়ে শোল মাছ। লাল শাক ভাজি। ডাল। নারকেলের ভর্তা।

বাঃ বেশ। খাওয়াটা ভালই হবে। ডাল আর নারকেলের ভর্তা হলেই আমার চলবে। ভাল খাবার খেতে না পেয়ে জিহ্বায় চড়া পড়ে গেছে সই।

— কি আমার ভাল খাবার। তুই তো বেশি কিছু খাসই না।

নীতা হেসে মাথা নাড়ে।

বুড়ি রমিজাকে ডেকে বলে, ও রমিজা, সই আজ এখানে ভাত খাবে।

— ভালই তো। তারপর নীতার দিকে তাকিয়ে বলে, আম্মার সই এলে আম্মা খুব খুশি হয়। আপনি কিন্তু বেশি বেশি করে আসবেন।

— প্রায়ই তো আসি।

— কই আসেন? একবার গেলে আম্মার কথা তো ভুলেই যান। আবার কতদিন পরে মনে পড়ে।

— পথে পথে ঘুরি। আখড়ায় দিন কাটে। আমাদের কি পথের ঠিক আছে।

রমিজা হেসে মাথা নাড়ে। চুলো থেকে ভাত নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বুড়ি ডালায় করে মুড়ি এনে নীতার সামনে দেয়। ঘটিতে করে জলও। রইস বারান্দার একপাশে বসে আছে। মুখ দিয়ে লালা পড়াচ্ছে। বাম হাত দিয়ে বারবার মাছি তাড়ায়। বুড়ি নাতিকে ঘুম পাড়ায়।

নীতা রইসকে মুড়ি দেয়। ও খাবার জন্যে আগ্রহ দেখায় না। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। নীতা হেসে ফেলে।

— আমাকে তোর ছেলের পছন্দ নয় সই, দেখতেই পারে না।

— ওর কথা আর বলিস না। আমার কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা ছিলরে সই।

— ঐ দেখ কি কথায় কি কথা। যা তোর নাতিকে শুইয়ে দিয়ে আয়। ও ঘুমিয়ে গেছে।

বুড়ির ওঠে না। নাতিকে কোলে দোলায়।

নীতা আনমনে মুড়ি চিবোয়। রমিজার রান্না শেষ হয়েছে। গনগনে চুলো লাল হয়ে আছে। তাপ ছড়াচ্ছে। রমিজা গামছা নিয়ে পুকুরঘাটে যায়। নীতা ওর চলার দিকে তাকিয়ে বলে, তোর বৌমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে রে?

বুড়ি বোকার মত বলে, হ্যাঁ ও খুব ভাল মেয়ে।

নীতা পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। মুড়ির দিকে মনোযোগ নেই। খেতেও ভাল লাগে না। শুকনো মুড়ি গলায় আটকে যায়। আনমনে দূরের জামরুল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঠোনের ওপর দিয়ে একটা তিতির ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। বুড়ি অস্বস্তি বোধ করে। কোলের মধ্যে নাতি ঘুমিয়ে গেছে। ওকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসতেও ইচ্ছে করে না। কি হল নীতার? ওর মনে দোতারার তার কি ছিঁড়ে গেল? এমন বেসুরো হয়ে গেল কেন? কি যেন ভাবছে নীতা। কখনো নীতা এমনি করে বুড়ির কাছ থেকে সরে যায়। কখনো কাছে এসে আপন হয়ে। তখন বুড়ির মনে হয় নীতা আজ একলা এসেছে। সঙ্গে কেউ নেই।

— তোর মনের মানুষ কৈ সই?

— মনের মানুষ?

— ওমা ভুলে গেলি নাকি? তোর চরণদাস?

— চরণদাস আখড়ায়।

— এলো না তোর সঙ্গে?

— এখন আমি ওর কেউ না। ও আবার মনের মানুষ জুটিয়েছে। ওর কথা বলিস না সই। জাত ছোটলোক। এমন হারামী লোক আমি দেখিনি।

— তাহলে তুই এখন কি করছিস?

— আমার জন্যে এখন আছে অখিল বাউল। খুব ভাল মানুষ। সারা-দিন বসে বসে গান লেখে। ঐ যে গাইলাম ওটা তো ওর লেখা গান। আমাকে বলে কি জানিস সই? বলে আমি ঘরে বসে বসে গান লিখবো তুই রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে বেড়াবি। তবে তো দেশের মানুষ দেশের কথা জানবে। আমরা যদি গানে গানে না জানাই তবে গাঁয়ের লোকগুলো জানবে কোথা থেকে? ওর কথা শুনলে পরাণ জুড়িয়ে যায় সই। বড্ডো ভাল

ভাল কথা বলে অখিল বাউল। আখড়ায় কত লোক আসে। রোজ আমি ওর গান গাই। লোকে চুপ করে শোনে। জানিস কারো কারো চোখে জলও এসে যায়।

অখিল বাউলের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নীতা। আবেগে চোখ বুজে আসে। ও গুনগুন করে। নীতার শুকনো মুখে দেশের রেখা খুঁজে ফেরে। ও এখন অন্য জগতের বাসিন্দা।

আগে যখন গান গাইতাম তখন মনে হতো নিজের জন্য গাই। এখন মনে হয় সবার জন্য গাই। গাইতাম ভক্তির গান, প্রেমের গান। এখন গাই দেশের গান।

নীতার মুখে প্রশান্তির ছাপ। বুক ভরে শ্বাস টানে। বুড়ির দম আটকে আসতে চায়। অবাক হয়: নীতা এত কথা শিখল কোথা থেকে? ও তো এত কথা জানত না? আগে কখনো বলেনি। ওর মনের মানুষ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ভিখ করত, গান গাইত। সঙ্গী ছাড়া পথ চলতে পারতো না।

– তুই এতো কথা শিখলি কোথা থেকে সই?

– সবই অখিল বাউল। একদিন আখড়ায় আমার গান শুনে ঘরে নিয়ে গেল। রাতভর আমার গান শুনল। অখিল বাউলের মত এমন করে কেউ আমার গান শুনতে চায়নি। আমি মন-প্রাণ ঢেলে গাইলাম। মনে হল এমন করে কোনদিন কার জন্যে গাইনি। আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম সই। চরণদাস আমাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে কেবল চিৎকার করে গান গাইতে ইচ্ছে করত। আমি ওকে ভুলতে চাইছিলাম। নিজের দুঃখ ছাড়াতে চাইছিলাম। অখিল বাউলের মিষ্টি কথায় সেদিন আমার গলা গানের নদী হয়ে গিয়েছিল। গান শেষে অখিল আমাকে বুকে টেনে নিল। তখন অনেক রাত। চারদিকে নিঝুম অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ-র ডাকও বন্ধ ছিল। শেষ রাতটুকু দু'জনে চুপচাপ শুয়েছিলাম। কেউ একটি কথাও বলিনি। অখিল বাউলের চওড়া বুকে অনেক তাপ সই। আমার মনে হয়েছিল জনম বুঝি এবার সার্থক হলো।

বুড়ি সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে নীতার কথা শোনে। নীতা যেন রূপকথার গল্প বলছে। সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারের গল্প। বুড়ির জীবনের ছায়া সেই সমুদ্রের পাড়ে আর পড়ে না। সেজন্যেই গল্পের জন্যে বুড়ির এখন এত ঔৎসুক্য। শুনতে পেলে আর ছাড়ে না।

জানিস সকালে উঠে অখিল আমাকে বললো, তুই এখন আমার সাথী। এই ঘর তোর আর আমার। নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখালো। বললো, এই বুক তোর ঘুমুবার জন্যে। আর তোর ঐ মিষ্টি গানের গলা তোর একলার নয়। ঐ গলা সবার। এবার থেকে আমি গান বাঁধবো। তুই গাইবি। মাস তিনেক অনেক গান গাইলাম: বিরহের গান, দেহের গান, বাউল গান, মরমি গান কতো কি? তারপর জানিস সই সেই ফাগুন মাসে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর ও বলল, এসব গান আর ভাল লাগে না নীতা। এবার থেকে অন্য গান বাঁধবো। আমি বললাম কি? বলল, দেশের গান। দেশের মানুষ এখন অন্যরকম হয়ে গেছে রে: দেশের গান দিয়েই ওদের এখন জাগিয়ে রাখতে হবে। এই গান দিয়েই আমরা আজ দেশের কাজ করবো। সেই থেকে আমি এই গান গাই। আর অন্য কিছু ভাল লাগে না। কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে গান গাইলাম। লোকে

আমাদের ঘিরে ধরে রে। শরীরে খুব যোশ পাই। জানিস পরশুদিন যখন গান গাইতে শুরু করলাম লোকে আমাদের সঙ্গে গাইতে শুরু করলো। ওরা বলল, আমরাও তোমার সঙ্গে গাইবো। আমি এক লাইন গাই তারপর ওরা গায়। সে কি উত্তেজনা! সকলে দেশের গানে পাগল হয়ে উঠল। মনে হল আকাশ-বাতাস যেন গানে গানে ভরে গেল। কালকে তোর কথা মনে হল। তাই আজ চলে এলাম দেখতে।

– সেই মানুষটাকে আনলি না কেন?

– ও বেশি বেরুতে পারে না। মাঝে মাঝে পায়ে একটা ব্যথা হয়।

– আবার এলে আনবি।

– হ্যাঁ তোর এখানে একবার না আনলে নিজেই শান্তি পাব না যে।

নীতা দু'হাত দিয়ে চুলের খোঁপা বাঁধে।

– বেলা অনেক গড়িয়ে গেল এবার উঠি সই?

বুড়ি নাতিকে দোলনায় শুইয়ে দেয়। রমিজা গোসল সেরে ফিরে এসেছে। ভিজে কাপড় সপ্ সপ্ করে। ওর ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে নীতার দেহ শীতল হয়ে যায়।

– চল সই ডুব দিয়ে আসি।

বুড়ির কথায় সাড়া দেয় নীতা।

– চল। যা গরম। সব যেন পুড়ছে।

দু'জনে পুকুরের ঘাটে এসে দাঁড়ায়। পুকুরের শ্যাওলা সবুজ জলে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ছায়া দেখে নীতা। চারদিকে ঘন ঝোপঝাপ। তারই ছায়ায় ঠাণ্ডা শীতল জল। এই গরমেও গায়ে হিম ধরে। পুবদিকের একটা গাছে বসে কুটুম পাখি ডাকে।

– বুড়ি বলে, আজকাল কেবলই কুটুম পাখি ডাকে।

– কুটুম আসবে।

– তেমন কুটুম আর কৈ? আর আসবেই বা কে? আছেই বা কে? বুড়ি যেন নিজেকেই বলে। নীতা সরসরিয়ে পানির বুকে নেমে যায়। এক ডুবে চলে যায় পুকুরের মাঝখানে। বুড়ি ঘাটের কাছাকাছি থেকে ডুব দেয়। ও কথনো গভীর জলে যেতে পারে না। কেমন ভয় লাগে। শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। দুই তিন ডুব দিয়ে বুক পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ি এক দুই তিন। কুটুম পাখি ডাকে একটানা। বুড়ির মনের এ কুটুম পাখির আনাগোনা। কুটুমের আগমনের উল্লাস নেই, কেমন একটা থিতানো ভাব। এই কুটুমের জন্যে পিঠে পুলির উৎসব নেই। বরং জল ছেড়ে চুলো নিবিয়ে লুকিয়ে থাকা। বুড়ি বিষণ্ণ হয়ে যায়। জলের বুকে নিজের শরীর। মাথার ভেতর কুটুম পাখির আনাগোনা। চেতনায় সুপোরি বাগানের আলো-আঁধারি। বুড়ির মন ছটফট করে। দুপুরের সূর্য ঠিক মাথার ওপর। গরম রোদ পুকুরের পানিতে তেমন উত্তাপ দেয় না। ছায়া ছায়া বিস্তার। পাড় ঘেঁষে ডাহুকের ঠোঁটের মত কালো জল। ফিসফিসানি শব্দের মত পাতা ঝরে। হলুদ পাতা জলে ভাসে। গাছের নিচে বিছিয়ে যায়। বুড়ি জল ছেড়ে ঘাটে উঠে যায়। ভেজা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ে। নীতা চিৎ-সাঁতারে পুকুরের জলে ভাসে। ওর মনে অখিল বাউলের ছবি। অখিল বাউলের গন্ধভরা উত্তাপ। কণ্ঠে অখিল বাউলের

গান। বুড়ির মন এখন মুছে যাওয়া শ্লেটের মত। ধার কমে গেছে তেমন গভীর দাগের আঁচড় পড়ে না। বুড়ি ভাবে, নীতা সব পারে। এজন্যে জীবন ওর কাছে বোঝা নয়। জীবনের দায় ওকে কাঁধে বোঝা খুটের মত বাঁকা করে রাখে না। কিন্তু বুড়ি ক্লান্ত হয়ে গেছে। ওর আর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। জীবনকে যত আঁকড়ে ধরেছে তত বঞ্চিত হয়েছে। ও যদি পারত সব বন্ধন পিছে ফেলে রেখে কেবলই এগিয়ে যেতে, যদি পারত পথে পথে গান গাইতে, মন চাইলে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়তে, শ্রান্তিতে কারো বুকে আশ্রয় নিতে। ধুত বুড়ি কিছুই পারবে না। ওর তেমন শক্তি নেই। সবকিছু এক জায়গায় এসে আটকে থাকে। বুড়ি মানসিক দিক দিয়ে যতই এগিয়ে যাক না কেন পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। বেরুনোর কোন পথ নেই। তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে নীতার ভাসমান শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও নিশ্চিত নির্ভাবনায় হাল ছেড়ে দিয়ে ভাসছে। উঠে আসার কোন লক্ষণ নেই।

বুড়ি ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ে। শুকনো কাপড় গায়ে জড়ায়। শরীরের এখানে সেখানে জলের ফোঁটা লেগে থাকে। নীতা পুকুরের মাঝখান থেকে চিৎকার করে।

— কিরে তোর হয়ে গেল?

— হ্যাঁ। উঠে আয় সই। খিদে পেয়েছে।

— বড় ঠাণ্ডা জল। আর একটু থাকি?

বুড়ি নিরুপায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। নীতার কথার পিঠে কোন কথা বলতে পারে না। নীতার ইচ্ছেশক্তি আছে। ও যখন যা খুশি তা করতে পারে। বুড়ির চারপাশে তো নিয়ম। তাই নীতার জন্যে ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? খানিকক্ষণ বিরতির পর আবার কুটুম পাখি ডাকে। বুড়ি অস্থির হয়ে ওঠে। হাঁ করে আকাশ দেখে। এখন কত বেলা? বুড়ি সরে এসে নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। মনের বিষণ্ণতা কাটে না। ছায়া ছায়া ঝোপঝাড়, শ্যাওলা জল, হাঁসের ঝাঁক, মাছরাঙা সবকিছু দৃশ্য ওর চোখের সামনে ওলোটপালোট খায়। মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। ওখানে আর কুটুম পাখি আসে না। বুড়ি অনায়াসে পাখির ডাক ঝেড়ে ফেলে। নীতা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

— উঃ অনেকদিন পর শরীরটা একদম জুড়িয়ে গেল। তোর এখানে এলেই মন আমার ঘরের দিকে ছোটে সই।

বুড়ি কথা বলে না। নীতা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ে।

— রাগ করছিস নাকি? খুব খিদে পেয়েছে? মনের মত কিছু হলে আমার আবার খিদেটিদে উবে যায়।

— হয়েছে চল।

বুড়ি আগে আগে হাঁটে। পেছনে নীতা।

রমিজা ভাত বেড়ে গুছিয়ে রেখেছে। সব কাজ ও খুব পরিপাটির সঙ্গে করে। সলীম কলীম কেউ ফেরেনি। কখন ফিরবে ঠিক নেই। ওদের ভাত শিকায় উঠিয়ে রাখে। খেতে বসে খুশি হয়ে যায় নীতা।

— বাহ্ বউ তো খুব ভাল রাঁধে। আমরা হাটখাটের মানুষ। যত্নের খাবার পেলে ধন্য হয়ে যাই।

— তুই ঘর বাঁধিস না কেন সই?

— ধুত ওসব সয় না।

এক ঢোক জল খায় নীতা। ভর্তা দিয়ে ভাত মাখিয়ে একটু একটু করে খায়। বুড়ির আগে খাওয়া হয়ে যায়। হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। নীতার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় তড়িঘড়ি করে আয়েশটা শেষ করে দিতে চায় না ও। আয়েশ উপভোগ করতে চায়। বুড়ির সব কাজে ছুটোপুটি। ঝটপট শেষ করে ফেলে। হরিণের মত বুড়ি আগে আগে দৌড়ায়। আর নীতা কচ্ছপ। ধীরে ধীরে ছন্দতাল সব বজায় রাখে। তাই নীতার জীবনে ছন্দপতন হয় না। ও অনায়াসে তাল ঠিক রাখে। আর বুড়ির তাল কেটে যায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ি চিকন সুপোরি কাটতে বসে। বিকেলের দিকে পান চিবুতে চিবুতে চলে যায় নীতা। পিঠে কাপড়ের পুঁটলি, হাতে দোতারা, কণ্ঠে গান:

জননী জন্মভূমি

আমার সোনার বাংলাদেশ........

নীতা বোধহয় পথ খুঁজে পেয়েছে। নীতার সেই অস্থিরতা নেই, মনের মানুষের অভাব ওকে বিষণ্ন করে রাখে না। এখন একলাই পথ চলতে পারে। কারো অপেক্ষায় বসে থেকে পথচলা থামিয়ে রাখে না। ও নিজের ভেতর একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। ওর আর অন্য কিছুর দরকার নেই। আসলে এমনি হয়। ভেতরের চাওয়া ফুরিয়ে গেলে বাইরের কোন কিছুর জন্যে আর ছুটতে হয় না। তখন নিজের ওপরে চমৎকার ভালবাসা গজায়। সমাহিত হয়ে যায় মন। বারান্দায় এক কোণে মাদুর পেতে রমিজা ছেলে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হয় না যে পৃথিবীর জন্যে কোন চিন্তা ওর মনে আছে। এ জন্যেই ও শান্তিতে ঘুমোতে পারে। যত জ্বালা বুড়ির। এমন একটা মন না থাকলেই বোধ হয় ভাল হত। কখনো অকারণ যন্ত্রণায় বুক ফেটে কান্না আসে। পরক্ষণে বুড়ি নিজেকে শাসায়। খারাপ কিছু না ভাবাই ভাল। আসলে রমিজার ঘুমের অন্য কারণ আছে। সারাদিন ভীষণ খাটুনি করে বেচারী। সংসারের সব কাজ একলা সামলায়। খুব অসুবিধা না হলে বুড়িকে ধরতে দেয় না। বুড়ির মায়া হয় ওর জন্যে। দুপুরে ঘুমোতে পারে না বুড়ি। সলীম কলীমের ভাত আগলে বসে থাকতে হয়। এই একটা কাজ রমিজা ওকে দিয়েছে। রাতের বেলাও তাই। ওদের ফিরতে যত রাতই হোক বুড়ি ওদের ভাত নিয়ে বসে থাকে। আজও বারান্দার ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বাড়িটা চুপচাপ। নিস্তব্ধ। বুড়ি নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে বুক মোচড় দিয়ে ওঠে। নীতার দোতারার টুংটাং শব্দের মত।

দুপুরে কিংবা বিকেলে মাঝে মাঝে জলিল আসে। খুব দ্রুত বুড়িয়ে গেল ও। বুড়ির কাছ থেকে পান চেয়ে নিয়ে খায়। এখন আর কেউ নেই ওর। মা-ও মারা গেছে

অনেকদিন আগে। কোনদিন রাঁধে, কোনদিন রাঁধে না। কখনো রমিজার কাছে এসে বলে, হাঁড়িতে কিছু আছে নাকি রমিজা?

রমিজার হাঁড়িতে পান্তা সব সময় থাকে। জলিলকে কখনো ফিরিয়ে দিতে হয়নি। বুড়ি কাছে বসে জলিলের খাওয়া দেখে। জলিল কখনো মুখ তুলে বলে, নেংটি পরা মানুষগুলোর পেটে ভাত না থাকলে কি হবে কলজায় সাহস আছে বুড়ি। সেই দিনকার ঢাকা শহর তো তুমি দেখনি। অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। মিছিল আর মিছিল। এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। তারপর– তারপর রাতের অন্ধকারে ..... নাহ্ মাথাটা কেমন করে। গুলি– আগুন।

– এসব কথা থাক। তুমি খাও জলিল ভাই।

– আমাদের হাতে কিছু ছিল না বুড়ি।

– ছিল না এখন জোগাড় কর।

– সেটাই তো করছি। প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না।

জলিলের খাওয়া শেষ হয়। বুড়ি পান এগিয়ে দেয়। পান নিয়ে চলে যায় ও। বুড়ি যাঁতিতে চিকন সুপোরি কাটে। কুটুস কুটুস শব্দে বুড়ির মনে হয় সোনার কাঠি, রূপার কাঠি। জলিলের কথাগুলো রূপকথার মত। বন্যা, খরা, আকাল ছাড়া আর কোন দানব তো বুড়ির চোখে পড়েনি। অথচ জলিলের কথায় সেই দানবের একটা ছবি ফুটে ওঠে। ওর সুপোরি কাটা থেমে যায়।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। বুড়ির সিঁদুরিয়া গাছের আমে পাক ধরেছে। ওর মনে খুশি। নাতিটাও বেশ ডাগর হচ্ছে। কি যে আনন্দ ওকে নিয়ে। এখন ওকে বুকে করে এখানে ওখানে যায়। পরিবর্তনটা সহজেই টের পায়। কি যেন হয়েছে ওদের। এবার অন্যরকম। বুকের ছাতি ফুলিয়ে 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে না। সলীম কলীমের মুখ শুকনো। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে না। কথা বললে রেগে যায়।

আবার মনে ভাবনা এসে জড়ো হয় বুড়ির, হলদী গাঁর লোকের চোখে মুখে কেন সন্ত্রাস? কাচারীঘরের পাশে দাঁড়িয়ে একদিন সলীম আর জলিলের কথা শোনে।

– গাঁয়ে ঢোকার মুখের পুলটা যদি ভেঙে দেই জলিল চাচা তাহলে ওরা আর ঢুকতে পারবে না?

– না রে ঠিক হবে না। ছোট্ট একটু নদী। ওরা নৌকা জোগাড় করে পার হবে। কিছুতেই ওদের আটকে রাখা যাবে না।

– হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ভেঙে দিলে বরং গাঁয়ের লোকের অসুবিধা হবে।

দু'জনে চুপ করে থাকে। বুড়ি সরে আসে। খালে। খালে দাঁড়িয়ে দেখে। স্টেশনে যাবার রাস্তার পাশেও দাঁড়ায়। লোকগুলো ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করে। সবার চোখে আতঙ্ক। বুড়ি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। কি হবে আবার? ওরা কি এত ভাবে? ঘুরেফিরে রমিজার কাছে এসে বসে।

– জানিস রমিজা ওদের যেন আবার কি হয়েছে?

রমিজা ডালের পাতিল নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে তাকায়।

– ক্যাদের?

— ঐ যে হলদী গাঁর লোকগুলোর।

— ধুত আম্মার যে কি বাতিক। কেবল সারাদিন রোদে ঘোরাঘুরি করলে মাথা গরম হবে না।

ও খলুইয়ে রাখা মাছগুলো টেনে নিয়ে মাছ কাটায় মনোযোগ দেয়। বুড়ি আর কথা খুঁজে পায় না। রমিজা অবলীলায় কচকচ করে মাছ কাটে। রক্তের ধারা গড়ায় বঁটির গায়ে, রমিজার হাতে, মাটির ওপরে। তাজা ফটফটে মাছগুলো সলীম পুকুর থেকে ধরে দিয়ে গেছে। এক খ্যাপে অনেক উঠেছে। জালে বেঁধে মাছ ওঠানোও দেখেছে বুড়ি। আজ ভেতরের পুকুর থেকে মাছ ধরেছে ও। সলীম কখনো এক খ্যাপের বেশি দুই খ্যাপ দেয় না। নিজের হাতে মাছ মারাটা সলীমের বিশেষ শখ। পারতপক্ষে অন্য কাউকে দিয়ে মাছ ধরায় না ও। বিশেষ করে বাড়ির পুকুরের মাছ। জাল ঝেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো বুড়িই টুকরিতে উঠিয়েছে। এনে ডালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কাটতে বসেনি। রমিজা অন্য কাউকে কাটতে দেয় না। এ নিয়ে বুড়ি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে।

— আরেক জন্মে তুই ঠিক মেছুনী ছিলি রমিজা। নইলে মাছের সঙ্গে তোর এত ভাব কেন?

রমিজা হাসে। সেই চিরাচরিত খকখক হাসি। ওর মাছ কাটা শেষ হলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

— আপনি যে সারাদিন কি এত ভাবেন আম্মা?

— বুড়ি ওর কথায় উত্তর না দিয়ে বলে, কুটুম পাখি ডাকে রমিজা।

— ডাকুক। কে আর আসবে। আমার বাপ তো গত মাসেই এসে গেল। এই মাসে আর আসবে না।

রমিজা মাছ ধুতে পুকুরঘাটে চলে যায়। কখনো বুড়ির এ ধরনের উদ্ভট ভাবনা চিন্তায় ও রেগে যায়। শাশুড়ী বলে বেশি কিছু বলতে পারে না। রমিজার পিছু পিছু বুড়িও পুকুরঘাটে এসে বসে। জায়গাটা ভীষণ ছায়াচ্ছন্ন। জলের বুকে শ্যাওলা ভাসে। বেতবনে ডাহুক ডাকে। বিরাট একটা বরই গাছ পুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে। পচা পাতার গন্ধ আসছে, গন্ধ আসছে কাদামাটির। রমিজা ঘাটের জল ঘোলা করে মাছ ধুয়ে চলে যায়। মাছের আঁশটে গন্ধ বুড়ির কেমন বিদঘুটে লাগে। নারকেলের চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে পানির ওপর। সব কিছু একাকার হয়ে মুছে গিয়ে বটির গায়ে রক্তের ক্ষীণধারা বুড়ির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাজা ফটফটে মাছগুলোর লাফানি বন্ধ হয়ে যায় এক পোঁচে। বুড়ির মনে হয় কুটুম আসবে। অর্থাৎ এই যে এ কুটুম সে কুটুম নয়। বন্যা, মহামারী, খরা যেমন ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায় এ কুটুমের আগমন তেমনি। মাঠ ঘাট প্রান্তর তোলপাড় করে দিয়ে ওর আঙিনায় কুটুম আসছে।

রাতে ঘুম আসে না বুড়ির। সন্ধ্যারাত থেকে সলীম কলীম জল্পনা-কল্পনা করছে। ভোররাতে সলীম সীমান্ত পার হওয়ার জন্যে চলে যাবে। কলীম থাকবে ওদের দেখাশোনার জন্যে। রমিজা কান্নাকাটি করে এখন শান্ত হয়ে শুয়ে আছে। বুড়ি ওদের

কথা কিছুই বুঝতে পারে না। বিকেলে জলিল বলছিল গ্রামে থাকা নাকি নিরাপদ নয়। তাড়াহুড়োয় বেশি কথা বলতে পারেনি। সলীমের সঙ্গে জলিলও যাচ্ছে। জলিলের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হয়নি। ওরা ভীষণ ব্যস্ত। কথা বলারও সময় নেই। গাঁয়ে কি হলো আবার? বুড়ির জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। গ্রাম থেকে কাউকে পালিয়ে যেতে হয়নি। যত কিছুই ঘটুক সকলে গ্রামে থেকেছে। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে বুকে বুক মিলিয়ে। কিন্তু এখন কি হল? কারা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? হলদী গাঁ কি দখল করে নিল কেউ? এর আগে হলদী গাঁ কোনদিন এমন করে নিজেকে জানান দেয়নি। বুড়ির ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে শহর থেকে লোক আসত বসন্তের টিকা দেবার জন্যে তখন বুড়ি দেখতো বাড়ির মেয়েরা ভয়ে যে যেদিকে পারত লুকিয়ে যেত। কিন্তু তখন তো গোটা গাঁয়ের লোকের চোখেমুখে এমন ভয়-ভীতি দেখেনি। বরং লুকোনোর জন্যে বাবার কাছে গালি শুনত ওর মা, চাচি, বোনেরা। এখন কি হল? বুড়ির কিছুই ভাল লাগে না। বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় এসে বসে। ওপাশ থেকে সলীম ডাকে দেয়।

— কি হয়েছে মা?

— কিছু না রে।

— বাইরে গিয়ে বসলে কেন?

— বুকটা কেমন ধড়ফড় করে।

সলীম উঠে এসে ওর পাশে বসে। কলীম আসে। রমিজাও। বুড়ি টের পায় আসলে ওরা কেউই ঘুমোয়নি। সবাই চুপচাপ শুয়েছিল কেবল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওরা আকাশ পাতাল ভাবছে। হঠাৎ বুড়ি শব্দ করে কেঁদে ওঠে। নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। এ কদিনের গুমোট পরিবেশে ভেতরে ভেতরে একটা রুদ্ধ অভিমান জমে উঠেছিল। আজকের কান্না তার বহিঃপ্রকাশ।

— আঃ মা চুপ কর। কেউ শুনতে পাবে।

— তুই যাবি কেন বাবা?

— খবর পেয়েছি গ্রামে মিলিটারি আসবে।

— মিলিটারি? বুড়ির চোখ বিস্ফারিত হয়।

বুঝতেই পারছ আমাকে পেলে ওরা জ্যান্ত রাখবে না। বসে বসে মরার চাইতে ওদের সঙ্গে একবার লড়েই দেখি। শোন মা, আমি যে যাচ্ছি একথা কাউকে বলবে না। জানাজানি হলে তোমাদের ওপর বিপদ আসবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সোজা বলে দেবে জানি না।

বুড়ি মাথা নাড়ে। কলীম চুপ করে বসে আছে। ও এমনিতেই কম কথা বলে। অন্ধকারে ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা করে। সলীম একটা বিড়ি ধরায়। রমিজার ছেলে কেঁদে উঠলে ও চলে যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ওদের পাঁচজনের সামনে হাঙরের মুখের মত হাঁ করে আছে। কারো মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। সামগ্রিক অবস্থাকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কেউ ধরতে পারছে না। সলীম লড়তে যাচ্ছে। ফলাফল জানা নেই। ও ফিরে আসতে পারবে কি না জানে না। যারা এখানে থাকবে তারাও একটা অনিশ্চিত

অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর বাইরে ওরা আর কেউ কিছু জানে না। ওরা খুব সাধারণ। ওদের কোন গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই– চেতনা নেই। ওরা কেবল বোঝে দেশের সীমানা এবং মাটি। এটুকু সম্বল করেই ওরা এগোয়। বিপদে বুক পেতে দেয়। প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণের এই গভীর টানটুকু আছে বলেই ওরা অনমনীয় এবং দুর্বার হয়ে ওঠে।

সলীম শেষ টান দিয়ে বিড়িটা উঠোনে ছুড়ে ফেলে। ওরা তিনজন অনেকক্ষণ ধরেই চুপচাপ। কারো মুখেই কথা নেই। কলীম হাই তোলে। সলীম উঠে দাঁড়ায়।

– যাও মা ঘুমোও। আবার ভোররাতে উঠতে হবে।

বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। সলীম বুড়ির কাছে এসে বসে।

– ও-মা–মাগো। তুমি এমন করলে কে আর আমাকে শক্তি যোগাবে বল? তুমি মন খারাপ করলে কে আর আমাকে সাহস দেবে? ভোর ভোর রওনা করতে না পারলে দিনের বেলা আবার সব জানাজানি হয়ে যাবে। যাও মা, ঘুমোও।

সলীম বুড়িকে হাত ধরে টেনে ওঠায়। ওর কথায় বুড়ি কোন সান্ত্বনা পায় না। উঠতেও ইচ্ছে করে না।

– তোরা যা বাবা। আমি একটু পরে আসি।

সলীম কলীম চলে যায়। আশেপাশের ঝোপঝাপে খস্ খস্ শব্দ হয়। বুড়ির বুক ভয়শূন্য হয়ে থাকে। শুধু সলীমের পালিয়ে যাওয়া ওকে কেমন অভিভূত করে রাখে। ও কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ঝিঁঝির শব্দে বুড়ির কানে তালা লাগে। বাঁশবনের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরের আকাশটা ধূসর, ম্রিয়মাণ। ফেলে আসা দিনের মত মনে হয় বুড়ির কাছে।

একসময় ও বিছানায় ফেরে। রইস হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ও কিছুই জানে না। রইসের পাশে গুটিশুটি শুয়ে পড়ে বুড়ি। ঘুম আসে না। পাশের ঘরে রমিজা কাঁদছে। বিয়ের পর থেকে দু'জনে কোনদিন একলা হয়নি। সলীম ওকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ি নিয়ে গেছে আবার নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। রমিজা এখন একলা হয়ে যাচ্ছে। সলীম খুব নরম স্বরে কথা বলছে। বুড়ির ভাবতে ভাল লাগে, যে ছেলেটা একদম পাল্টে গেছে। ছেলে হবার পর থেকে আর সলীম ওর গায়ে হাত তোলেনি। রমিজার জন্যে সলীমের এখন অনেক ভালবাসা। সলীম এখন রমিজাকে বুকে নিয়ে আদর করছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। রমিজার কান্নার রেশ কমে আসছে। রইস ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে। বুড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে থাকে। কিছুতেই ঘুম আসে না।

ভোররাতে সলীম ওঠে। এক সানকি পান্তা খেয়ে নেয়। ছেলেকে আদর করে। বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। চুপিচুপি জলিল আসে, একটুও শব্দ না করে। বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নেয়। ওর ভিটের দিকে খেয়াল রাখতে বলে। সকাল সন্ধ্যায় ঘরদোর আঙিনা যেন ঝাড় দেয়া হয় সেকথা বলে। মাচায় অনেক ঝিঙে ধরেছে। তুলে এনে রাঁধতে বলে। শেষে জলিল চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। বুড়ির চোখও ছলছলিয়ে ওঠে। সলীম ধমক দেয়।

— আঃ চাচা কি হচ্ছে। চোখে পানি থাকলে যুদ্ধ হয় না চাচা। তাড়াতাড়ি যাই চলেন।

জলিল আর একটা কথাও বলে না। সলীমের সঙ্গে রওনা করে। একবারও পেছন ফিরে চায় না। কেশে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে না।

বুড়ি বাঁশবন পর্যন্ত আসে। মনে হয় এ ঘটনা ওর জীবনে একদম নতুন। কাউকে এমন করে কোনদিন চলে যেতে দেখেনি ও। চুপে চুপে কাঁদে। জোরে কাঁদতে পারে না। নির্ঘুম চোখের পাতা জলের স্পর্শে কাতর। সে জল ধরে রাখতে চায় বুড়ি, মুছে ফেলতে ইচ্ছে হয় না।

সলীম চলে যাবার দু'দিন পরে স্টেশনে যাবার বড় রাস্তা দিয়ে মিলিটারি আসে হলদী গাঁয়ে। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে মাটি পুড়ে যায়। বাতাস দম ধরা। গাছের পাতা নড়ে না। বুড়ির সিঁদুরিয়া আম পেকে লাল। ওরা ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে ঢোকে। নদীর ধারে ক্যাম্প করে। বুড়ি স্টেশনে যাবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছে। কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। ওর মনে কুটুম পাখির আনাগোনা। ফিরে এসে ঘরের দাওয়ায় ধপ্ করে বসে পড়ে। রমিজার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ি বলে, কুটুম এসেছে রমিজা।

রমিজা কথা বলতে পারে না। ছেলেকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। মাছ-কোটা বটি উঠোনে কাত হয়ে পড়ে থাকে। চুলোয় আগুন জ্বলে না। দুই-মুখো চুলোটা শীতল ছাই বুকে নিয়ে শান্ত। রমিজা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলে, আমাদের কি হবে আম্মা?

— যা হয় হবে।

বুড়ি শক্ত মুখে সজনে গাছের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

— আমার ভয় করে।

— অত ভয় করতে নেই রমিজা। দে ছেলেটাকে আমার কাছে দে।

বুড়ি নাতি বুকে নিয়ে সুপোরি বাগানে আসে। ওখান থেকে ক্যাম্পটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওরা কি করে দেখতে চায় বুড়ি। এমন অতিথি বুড়ি আর কোনদিন দেখেনি।

রাতে কলীমের মুখের দিকে চেয়ে বুড়ির বুক মুচড়ে ওঠে।

— তুইও পালিয়ে যা কলীম?

— কেন মা?

— সলীম গেছে তোর থাকা ঠিক না।

— বড় ভাই যে চলে গেছে এই খবর মনসুর মেম্বার ওদের জানিয়ে দিয়েছে।

— তোকে কে বলল?

— মনসুর মেম্বারই। ওদের সঙ্গে মনসুর মেম্বার খুব জমিয়েছে। গাঁয়ের খবরাখবর দিচ্ছে।

— তুই কোথাও চলে যা বাবা?

— তোমাদের কি হবে?

– আমরা ঠিকই থাকতে পারব।

– তা হয় না মা। তোমাদের রেখে বাড়ি খালি করে আমি যেতে পারি না।

বুড়ি আর কথা বলে না।

– জান মা মনসুর মেম্বার বললো খুব লাফালাফি করছিলে বাবারা এবার মজা টের পাবে। ভিটের ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। আমি অবশ্য একটুও ভয় পাইনি। মনসুর মেম্বারের মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হচ্ছিল পাছায় দুটো লাথি মেরে দেই। ব্যাটা আস্ত শয়তান। উঃ কেমন করে যে হাসছিল। ভাবলে এখনো গা জ্বলে উঠে।

বুড়ি আর রমিজা কলীমের কথা শুনে কাঠ হয়ে যায়। কলীমের খাওয়া শেষ হলে বুড়ি আবার ওকে পালানোর কথা বলে। কলীমের চোখ লাল হয়ে ওঠে। রুক্ষভাবে বলে, নিজের ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না। ওদের ভয়ে পালাবো নাকি? কি করবে দেখিই না?

কলীম উঠোনে নেমে গেলে বুড়ির গলা দিয়ে ভাত নামে না। দু'তিনবার খেয়ে দুই ঢোক পানি গিলে উঠে পড়ে। বুকের ভেতর ভাতের দলা আটকে যায়।

তল্লাশি কুকুরের মত সারা গাঁয়ে সলীমকে খোঁজে ওরা। মনসুর মেম্বারের পালিয়ে যাওয়ার খবর অতোটা বিশ্বাস হয়নি। সলীমকে না পেয়ে কলীমকে ধরেছে। তখন ভোরের আজান দিয়েছে। কলীম বিছানায় কুঁকড়ি মেরে শুয়ে আছে। বুড়ি কেবল দরজা খুলে বেরিয়েছে, তখনই ওরা সাতজন সজনে গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়। বুড়ি কিছু ভেবে কুলিয়ে ওঠার আগেই ঘরে ঢোকে। রমিজা পুকুরঘাটে ছিল ওখান থেকেই সুপোরি বাগানে পালিয়ে যায়। বুড়ি বাঁশের খুঁটি ধরে বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কলীমকে ধরে আনে ওরা। ওদের হাতে কলীমকে দেখে দৈত্যের হাতে রাজপুত্রের মত মনে হয় বুড়ির। কলীমের চোখে তখনো ঘুম ভাঙা আমেজ। কলীমকে নিয়ে ওরা উঠোন পেরিয়ে চলে যায়। বুড়ি কিছু বলতে পারে না। ছুটে জলপাই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। কলীম একবারও পেছন ফিরে তাকাবার সুযোগ পায় না। ওরা সাতজন সৈনিক রাস্তা কাঁপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওদের কলরবে মাঠের চড়ুই নিশ্চুপ হয়ে যায়।

সারা বাড়িতে বুড়ি একলা। পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ছেলে বুকে নিয়ে পালিয়েছে রমিজা। ওর বাইশ বছরের যৌবনে ঝড়ের আশঙ্কা। কলীমকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় রমিজা হকচকিয়ে গেছে। কোন কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। পাট ক্ষেত না কচুরীপানা ভর্তি ডোবায় গিয়ে ঢুকেছে ও তা জানে না। জানার ইচ্ছেও নেই। রমিজা আপাতত নিরাপদে থাকুক এটাই কামনা। রমিজার ছেলের কথাও আর তেমন করে ভাবতে পারছে না। ঘরের মধ্যে রইস বসে আছে। রইস থাকা না থাকা সমান। যার কোন বোধই নেই সে আর কি কাজে লাগবে। নিরাসক্ত মুখে বারান্দায় বসে বাঁশবনের মাথার ওপর তাকিয়ে থাকে বুড়ি। পাতার ফাঁকে ছোট্ট একটু আকাশ দেখা যায়। ঝকঝকে নীল আকাশ। কোথাও কোন মেঘ নেই। প্রখর রোদ্দুর। রমিজা আজ ভাত ফোটায়নি। রমিজার চুলোয় আগুন নেই। ওর ইচ্ছে করছে আগুন জ্বালাতে। বাঁশপাতা আমপাতা বুকে নিয়ে চুলোটা যদি এখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে তবে বেশ হয়। ওরা দেখুক সবাই পালায় না। কেউ কেউ আগুন জ্বালায়। কিন্তু উঠতে পারে না। বুড়ির বুক

তোলপাড় করে। গফুরের মৃত্যুর সময় অনুভূতি যেমন থমকে গিয়েছিল আজ ঠিক তেমনি লাগছে। কিন্তু বুড়ির মুখে তার কোন প্রকাশ ছিল না। প্রাণপণে সমস্ত জাগতিক চিন্তাগুলো বাতাসে ওড়া তুলোর মত উড়িয়ে দিতে চাইছে। পায়ের কাছে বসে থাকা বাঘা কুকুরটা লেজ নাড়িয়ে গরগর করছে। বুড়ি তাও দেখছে না। সমস্ত বাড়ি এক অসীম শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। পুব দিকের আমড়া গাছটা ভীষণ চুপ। হাঁস দুটো পালকে মুখ গুঁজে বসে আছে। অথচ সবকিছু ছাপিয়ে বুড়ির চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলীমের চলে যাওয়ার দৃশ্য।

রমিজা অনবরত কাঁদে কলীমের জন্য। বুড়ি তাও পারে না। বুড়ির চোখে কোন জল নেই। সেটা এখন খাঁ-খাঁ মরুভূমি। দু'দিন পার হয়ে গেছে। রমজান আলীর কাছ থেকে খবর পেয়েছে কলীমকে খুব মারধোর করছে। সলীমের খবর জানতে চাইছে। কলীম কিছুই বলে না। কেবল যন্ত্রণায় কোঁকায়। বুড়ি নিজের হাত কামড়ায়। ঠিকই বলতো ওরা, বুড়ি আসলে কিছুই করতে পারে না। কিছুই করার ক্ষমতা নেই। পেরেছে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিতে। পারে বারান্দায় নইলে পুকুরঘাটে চুপচাপ বসে থাকতে। পারে অনেক দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে।

– আম্মা কলীম ভাইয়ের কি হবে?

বুড়ি রমিজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তর জানে ও। কিন্তু বলতে পারে না। জানে কলীমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। যেমন গাঁয়ের আরো কয়েকজন গেছে তেমন। ওদের লাশ পুঁতে ফেলেছে, নয় খালে ভাসিয়ে দিয়েছে। কলীমকেও কি তাই করবে? বুড়ি ছটফটিয়ে ওঠে।

– আম্মা আপনি কথা বলেন না কেন?

বুড়ির ঠোঁট কাঁপে। কথা বেরোয় না। রমিজা ফুঁপিয়ে ওঠে। ফুলি এসে খবর দেয়।

রমিজা'বু তাড়াতাড়ি পালাও মিলিটারি আসছে।

রমিজা পালিয়ে যায়। কোথাও আর কেউ নেই। শুধু বাঘা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তখুনি পুরো বাড়িটার ভৌতিক নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে বুটের শব্দে গাঁ ভাসিয়ে ওরা সাতজন খাকি পোশাক পরা লোক বুড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। কলীমকে বেঁধে এনেছে। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় বুড়ি। ও একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অমানুষিক অত্যাচারে ওর এখন ভিন্ন আদল। মহামারী কবলিত হলদী গাঁয়ের কলীম এখন বুড়ির চেতনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার জন্যে কোন শোক নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই। তাকে সাক্ষী করে জন্ম হয় আগুনের। সে বলে দিচ্ছে যেন প্রতিশোধের অবদমিত স্পৃহা।

কলীম তোর ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে কেন? তুই একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকা। সাহসী বারুদজ্বলা দৃষ্টি ছড়িয়ে দে হলদী গাঁয়ের বুকে। মুছে যাক মহামারী, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ। হলদী গাঁয়ের মাটি নতুন পলিমাটিতে ভরে উঠুক?

বুড়ি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে শক্ত রাখে, যেমনি ছিল তেমনি বসে থাকে। ও যেন ঠিক এমনি কতগুলো সময়ের সমষ্টির অপেক্ষায় ছিল। জানত বন্দী রাজপুত্রের মত কলীম আসবে। এই বাড়িটা জনমানবশূন্যপুরী হয়ে যাবে। কদাকার দানবের দল ছিন্নভিন্ন করে দেবে সাজানো সংসার। ওদের হিংস্র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় বুড়ি। একজন উঠোনে কলীমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি ছয়জন বুড়ির পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে। দুরন্ত আক্রোশে ক্রুদ্ধ হয়েছে ওরা। রইসের পিঠে এক ঘা লাগায়। হাবা-বোবা ছেলেটার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে এক ধাক্কায় ওকে বারান্দায় ফেলে দেয়। রইস কাঁদতেও ভুলে যায়। মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বের হয়। ও গুটিসুটি বুড়ির পাশে এসে বসে। পিঠে মুখ ঘষে। সান্ত্বনা চায়। পায়ে যে চোট লেগেছে তা ইশারা করে দেখায়। রইসের হাতটা নিজের মুঠিতে শক্ত করে চেপে ধরে বুড়ি। এতক্ষণ ও নিজের ভেতর একটা অবলম্বন খুঁজে পায়।

ওরা ঘরের ভেতর তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি জিনিসের প্রতি ওদের আক্রোশ। সব কিছু তছনছ করে মজা পায়। কাঁথা বালিশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। কাপড় চেরার ফত্‌ফত শব্দ কানে এসে লাগে। ওর মনে হয় এসব জিনিসের ওপর এখন আর কোন মায়া নেই। ওগুলো ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেললে একটুও খারাপ লাগবে না। বুড়ি একদৃষ্টে কলীমের দিকে তাকাতে পারে না। ওর সারা শরীরে কালশিটে দাগ। চোখের ওপরটা ফুলে গেছে বলে ভাল করে তাকাতে পারছে না। তবুও পাংশু বিবর্ণ দৃষ্টিতে বুড়িকেই দেখছে। ওর ঠোঁট নড়ছে। ও হয়ত কিছু বলতে চাচ্ছে। বুড়ি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না যে ঠিক এ মুহূর্তে কলীম কি বলতে পারে? ওর মনে এখন কিসের দাপাদাপি? বুড়ির মনে হয় কলীমের জন্মের ছয় মাস পর ওর মা মারা গিয়েছিল। সে মায়ের কথা কলীমের মনে নেই।

বুড়ি কে ? বুড়ি শুধু ওকে মমতা দিয়েছে। কিছু ভালবাসা। দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়েছে। এর বেশি কিছু বুড়ি ওর জন্যে করেনি। ঐটুকু সম্বল করেই এখন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। শুনতে চায় কলীম কি বলবে। ওর কাছে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামে। দু'পা এগোতেই রাইফেলধারী তেড়ে আসে। যেখানে বসেছিল সেখানে বসে থাকতে হাত দিয়ে নির্দেশ করে। ওর সেই ক্রুদ্ধ ভয়াবহ মুখের দিকে চেয়ে বুড়ির চোখের সামনে হলদী গাঁ দুলে ওঠে। সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। ফিরে আসে। অথচ ওর এখন ভীষণ ইচ্ছে করছে কলীমকে একবার ছুঁয়ে দেখতে। ওর রক্তে কিসের মাতামাতি একবার কান পেতে শুনতে চায়। মৃত্যুর ছায়া ভাসে যুবক কলীমের সমস্ত অবয়বে। বুড়ি আর তাকাতে পারে না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। সৈনিকের হেলমেটের ওপর দিয়ে দিগন্তে সে দৃষ্টি আছড়ে পড়ে। রইস ভীষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাঁশবনের মাথায় মৃদু বাতাস। বুড়ির অবয়বহীন কঠিন মন শিমুল বীজের মত ফেটে যেতে চাইছে।

যমদূতের মত বুড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা ছয়জন। ঘরের ভেতর কিছু না পেয়ে ক্ষিপ্ত। এতক্ষণ অকারণ শক্তি ক্ষয় করেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে ওদের

একজন। জানতে চাইছে সলীম গোলাবারুদ রেখেছে কোথায়? হলদী গাঁয়ের আন্দোলনের নেতার কাছে অস্ত্রশস্ত্র নেই এ কি করে সম্ভব? বুড়ি ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। ওরা যে ভাষায় কথা বলছে বুড়ির এত বছরের জীবনে তা কোন দিন শোনেনি। কেবল সলীমের নামটা ধরতে পারছে। ওরা বুড়িকে আকারে ইঙ্গিতেও বোঝাতে চেষ্টা করছে। বারবার। অনেকবার। উত্তর দেয় না। ওর গলার মধ্যে বাঘা কুকুরটার মত গরগর শব্দ হচ্ছে। তখুনি বুড়ির মনে হয় এরা কারা? এরা কি হলদী গাঁয়ের জলহাওয়া, পলিমাটি, নদীর কূলে বেড়ে ওঠা লোক? গাঁয়ের নেংটিপরা মানুষগুলো বুড়ির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওদের কথা ও বোঝে। শহর থেকে দু'চারজন এলে কষ্ট হলেও ওদের কথা বোঝে। কিন্তু এরা কেন বুড়ির খুব কাছের মানুষ নয়? তখুনি ও চিৎকার করে ওঠে, ঐ কলীম এই শুয়োরগুলি কি বলে?

ওরা কলীমকে ধাক্কা দিয়ে বুড়ির পায়ের কাছে ফেলে দেয়। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কলীমের দেহটা ওরা একজন পা দিয়ে চেপে রাখে। কলীম ধুঝি বাঁকানো বেত। ছেড়ে দিলে ছিটকে উঠবে। আসলে কলীম কিছুই করতে পারছে না। কলীমের হাত বাঁধা। অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত। তবুও হাত বাঁধা না থাকলে ও হয়ত একটা কিছু করত। অন্তত করতে চেষ্টা করত। সেটাও বুড়ির জন্য সান্ত্বনার কারণ হত। কলীমের অসহায়ত্ব বুড়িকে মরমে মারে। ওরা কলীমের পিঠে বুটের লাথি বসিয়ে বলছে, কোন খবর না দিলে ওরা কলীমকে মেরে ফেলবে। ওদের ক্রুদ্ধ আক্রোশে এখন বারুদের স্ফুলিঙ্গ। যে কোন মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠবে।

বুড়ি বিড়বিড় করে, তোর মা থাকলে কি করত আমি জানি না কলীম। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না? বড় পাওনার জন্য কাউকে কাউকে বুঝি এমনি করে মরতে হয় কলীম। তুই আর আমাকে মা ডাকিস না। আমি তোর মা হওয়ার উপযুক্ত না।

বুড়ি হাত দিয়ে চোখ মোছে। সলীমের মুখটা মনে হয়। পাশাপাশি দু'জনের। কে আগে সলীম না কলীম? বুড়ি সলীমকে কথা দিয়েছে ওর কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু নিজেও তো জানে না সলীম কোথায়? কলীম এখন মরে যাচ্ছে। একদম বুড়ির চোখের সামনে। বুড়ি কি করবে? বুড়ির জীবনের বিনিময়ে কি ওরা কলীমকে ছেড়ে দেবে? হঠাৎ বুড়ি চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমরা আমাকে মার। ওকে ছেড়ে দাও। ছুটে গিয়ে একজনের পা ধরে, তোমরা আমাকে মার? আমাকে মার ....।

ওরা ছয়জন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বুড়ির কথা বুঝতে পারে না। ফাঁক পেয়ে কলীম ছিটকে ওঠে।

— মা—

সঙ্গে সঙ্গে ওরা কলীমকে বুটের লাথি দেয়। কলীমের আর্তচিৎকারে বুড়ি চুপ করে যায়। আবার সিঁড়ির ওপর ফিরে আসে। আজ ওরা ছয়জন আজরাইলের মত। বুড়ি আজরাইলের একটা স্পষ্ট চেহারা বহুবার মনে করার চেষ্টা করেছে। পারেনি। এখন একটা সুস্পষ্ট ধারণা হচ্ছে।

ওরা বুড়িকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বুকের ওপর রাইফেলের ঠাণ্ডা নল চেপে ধরে আছে। গুলি করবার ভয় দেখাচ্ছে। কলীম মাঝে মাঝে মুচড়ে উঠছে। ফাটা মাঠের মত

কলীমের মুখ একটা কিছু চাচ্ছে। এক একবার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু শরীরটা পাথরের চাইতেও ভারি। টেনে ওঠানো যায় না।

ওদের গর্জনের মুখে বুড়ি কেবল বিড়বিড় করে, আমার কিছুই করার নেই। কেউ কেউ এমনি করেই মরে যায়। কাউকে কাউকে মরতে হয়।

বুড়ি আর কিছু করতে পারছে না। কণ্ঠে কোন শব্দ নেই। এমনকি কোরানের আয়াতও না? যে আয়াত স্মরণ করলে বুকে বল ফিরে আসে তা কেন একটাও স্মরণে আসছে না? গফুরের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাও পারে না। সমস্ত হলদী গাঁ একাকার হয়ে বুড়ির চোখের সামনে লুটোপুটি খায়। ওর কেবলই মনে হয় রমিজার ছেলে কোথায় যেন কাঁদছে।

বুড়ির কাছে কোন উত্তর না পেয়ে ওরা ফিরে দাঁড়ায়। নিজেরা কয়েক মুহূর্ত কি যেন আলোচনা করে। সদম্ভ পদক্ষেপে ভীষণ কিছু ঘোষণা করে। হেঁচকা টানে কলীমকে দাঁড় করিয়ে দেয়। উঠোনের মাঝখানে নিয়ে গুলি করে। মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া কলীমের দেহটা এক লাথি দিয়ে ওপাশে গড়িয়ে দেয়। আবার এক লাথি দিয়ে এপাশে। তারপর হাসিতে শিসে গানে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে ওরা চলে যায়।

গুলির শব্দ এসে বিঁধে বুড়ির হৃদয়ে। গুলির শব্দটা ঠিক সেই মুহূর্তে কলীমের মা ডাকের মত। তীক্ষ্ণ। তীব্র। এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যায়। বুড়ির মুখ দিয়ে কোন আর্তনাদের ধ্বনি বের হয় না। কেবল কুকুরটা ভীষণ শব্দে ঘেউ ঘেউ করছে। ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। মাটি আঁচড়াচ্ছে। দাঁড়িয়ে লম্বা নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইছে। সারা বাড়িতে আর কোথাও কোন শব্দ নেই। রইস মাকে ধরে ঝাঁকুনী দেয়। হাত ধরে টানাটানি করে।

বুড়ি দেখে কলীমের দেহ থেকে রক্তের স্রোত নেমেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল ফুলের মত লাল। ঐ শিমুল থেকে বীজ হবে। বীজ হয়ে ফাটবে। বাতাসে উড়ে বেড়াবে সাদা ধবধবে উজ্জ্বল তুলো। বুড়ির মনে হয় সমগ্র হলদী গাঁটা গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল হয়ে গেছে। ঐ শিমুলের সাঁকো পেরিয়েই হলদী গাঁ একমুঠো উজ্জ্বল তুলো হয়ে যাবে। আচমকা বুড়ির মনে হয় সলীমরা এ কথাই তো বলত। হলদী গাঁয়ের লোকগুলোর চোখে মুখে এ স্বপ্নই তো ভাসতো। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে, যে শব্দটা ওরা সারাদিন বলাবলি করত, তা ছিল স্বাধীনতা। শিমুলের মত লাল রক্ত পেরিয়ে সে স্বাধীনতা তুলোর মত ধবধবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বুড়ি লক্ষ্য করে রইস কখন যেন কলীমের পাশে গিয়ে বসেছে। খুব আস্তে আস্তে কলীমের গায়ে মাথায় মুখে হাত বুলাচ্ছে। ও কিছু বুঝতে পারছে না। নিজের হাতে রক্তের দলা নেড়েচেড়ে দেখে। গন্ধ শোঁকে। তারপর এক দৌড়ে বুড়ির কাছে ছুটে আসে। অবাক বিস্ময়ে দুর্বোধ্য শব্দে ও চিৎকারে বুড়িকে টানাটানি করে। চোখের সামনে সব কিছু কেমন আবছা অস্পষ্ট হয়ে যায়। রইসকে জড়িয়ে ধরে বুড়ি ডুকরে কেঁদে ওঠে। কলীমের তাজা রক্তের গন্ধ বুড়ির চেতনায়।

এক সময় কান্না থেমে যায়। রইসকে ধরে প্রবল ঝাঁকুনী দেয়। তুই কেন চুপ করে থাকিস রইস? তুই কোন কিছু করতে পারিস না? তুই ফেটে পড় রইস। আমিও তোর

সঙ্গে থাকব। আমরা দু'জনে মিলে হলদী গাঁয়ের জন্যে একটা কিছু করব। তোর কানটা যদি বোমা হয়ে ফেটে যায়। জিভটা যদি বুলেটের মত ছোটে? ও রইস তুই আমার গলা চেপে ধর। তুই আমাকে মেরে ফেল। বুড়ি গলা ফাটিয়ে কাঁদে। চিৎকারে বুকের ভেতরের সাত পরত দেয়াল ভেঙে গুড়িয়ে যায়। আশপাশের ঘরের লোকজন এসে ভিড় করে কলীমের পাশে। রমিজা কতদূরে পালিয়েছে কে জানে? এখনও ফিরেনি। রমজান আলী এবং আরো কারা যেন কলীমকে বারান্দার ওপর উঠিয়ে নিয়ে আসে। কবর দেয়ার কথা বলাবলি করে। বাকি সবাই বিমূঢ়। বুড়ি কোন কিছু শুনতে পায় না। কোন কিছু দেখতে পায় না। দেখে কলীমের রক্ত হলদী গাঁ শুষে নিচ্ছে। মাটি ভেদ করে সে রক্ত নিচে চলে যাচ্ছে। উপরের অংশ জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে। ও বিড়বিড় করে, হলদী গাঁ রক্ত খাচ্ছে। রমজান আলী জিজ্ঞেস করে, কি বলেন রইসের মা?

বুড়ি শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়।

— কলীমকে সুপোরি বাগানে কবর দিন রমজান ভাই।

— সে আমি সব ঠিক করব। আপনি কিছু ভাববেন না।

রমজান আলী চোখ মুছতে মুছতে নেমে যায়। ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে রক্ত দেখছে। কেউ কেউ হাত দিয়ে নাড়ছে। বুড়ির শূন্য দৃষ্টি আবার সে রক্তের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। মনে হয় কলীমের রক্ত হলদী গাঁয়ের মাটিতে নতুন পলিমাটি। আপন শক্তিতে উর্বরা হবার জন্যে হলদী গাঁ সে রক্ত ধারণ করছে। ওর মাথা পাক দিয়ে ওঠে। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দেয়। তখুনি শুনতে পায় বুক ফাটা চিৎকার করতে করতে রমিজা ঘরে ফিরছে।

দিন গড়ায়। বদলে যায় বুড়ির আপন ভুবন। যেন একটু ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে ওরা কটা প্রাণী চুপচাপ বসে থাকে। রাত্রি হলে কারো মধ্যে কোনো প্রাণ থাকে না। মাঝে মাঝে রমিজার ছেলে যখন জোরে কেঁদে ওঠে তখন ওরা বুঝি নিজেদের অস্তিত্ব টের পায়। তাও কি কাঁদবার জো আছে। ছেলে কাঁদলে রমিজা যেখানে থাকুক ছুটে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে থামিয়ে ফেলবে। বুড়ির মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যে ছেলেটা চেঁচাক। জোরে জোরে কেঁদে এই গাঁ-টা মাতিয়ে তুলুক। ঐ কান্নাগুলো ভাবুক যে এ গাঁয়ের লোকগুলো সব মরে যায়নি। বুড়ির ভাবনা রমিজা ধরতে পারে না। ধরার ক্ষমতাও নেই। তাই বুড়ির সঙ্গে ও রাগ করে। ওর ধারণা বুড়ি ছেলেটাকে ইচ্ছে করে কাঁদায়। কাঁদিয়ে মজা পায়। তাই বুড়ির কাছে দিয়ে রমিজার মত নেই। বুড়ি আপত্তি করে কখনো কখনো।

— ওকে একটু কাঁদতে দে না রমিজা? ওর দম আটকে কি তুই ওকে মেরে ফেলবি?

— কি যে বলেন আম্মা? কাঁদলেই তো দেওগুলো ছুটতে ছুটতে আসবে। তারপর সবাইকে গুলি করবে।

— করলেই হলো আর কি?

কথাটা বলেই থমকে যায় বুড়ি। থমকে যায় রমিজাও। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কলীমকে কবর দেয়া হয়েছে। সুপোরির ছায়ায় নিরিবিলি শুয়ে আছে। সবুজ ঘাসে ভরে গেছে সে কবর। রমিজা পাতা বাহারের গাছ লাগিয়েছিল সেটাও বেশ বড় হয়েছে। হলদী গাঁ কলীমের জন্যে কি সুন্দর সবুজ শান্তির ঘর বানিয়ে দিয়েছে। বুড়ির বুক কেমন করে। বড় করে শ্বাস নেয়। ঐ কবরের কাছে গিয়ে বসলে হলদী গাঁ-র জন্যে মমতা বাড়ে। কলীম যুদ্ধ করেনি, কিন্তু হলদী গাঁ-র জন্যে প্রাণ দিয়েছে। বুড়ি এখন রইসকে নিয়ে বাগানে সুপোরি খুঁজতে যায় না। কলীমের কাছে যায়। কিছু দোয়াদরুদ পড়ে। চোখের পানি আঁচলে মুছতে মুছতে ফিরে আসে। উঠোনের দিকে চোখ পড়ে। মাটি খুঁড়লে হয়তো উঠোনে রক্তের দাগও বেরিয়ে যেতে পারে। তবুও বুড়ি আস্তে আস্তে বলে, গুলি করা কি অত সহজ?

– সবই সহজ। রমিজা কথা খুঁজে পায়। এখন সবই সহজ। ছোট ভাইকে মেরে ফেললো। শামুর মা'র কথা একবার চিন্তা করেন আম্মা। কি যে দিনকাল হল।

রমিজা চাল বাছায় মনোযোগী হয়। শামুর মা'র কথা ও সহ্য করতে পারে না। বুড়ির বুকটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। বেচারী।

কলীমকে যেদিন মারলো ঐদিনই পাটক্ষেতের একবুক পানির মধ্যে লুকিয়েছিল ওরা সবাই। একটু দূরের রাস্তা দিয়ে একদল সৈন্য যাচ্ছিল।

কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠতেই শামুর মা ওকে পানির তলে চেপে ধরে। কোন কিছু ভাববার সময় ছিল না তখন। মিলিটারি চলে গেলে ওরা সবাই উঠে এল। শামুর মা'র বুকে তখন ছেলে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার অর্ধেক পথ এলে শামুর মা টের পায়। ভয়ে এত তটস্থ ছিল যে বুঝতেই পারেনি। কোল বদল করার সময়ই টের পায় যে ছেলেটা নড়ছে না। ভয়ে শামুর মা চিৎকার করেও কাঁদতে পারেনি। অসাড় হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি! বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। এখন ওর মাথার ঠিক নেই। দিনরাত বলে, ছেলেটাকে আমি নিজের হাতে মেরে ফেললাম। আল্লারে আমার কি হল? বুড়ি শামুর মা'র সামনে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সইতে পারে না টলটলে জলভরা বোবা চাউনি। রমিজার মত বুড়িও বিড়বিড় করে, কি যে দিনকাল হল। এমনি আরো কত ঘটনা আছে। রোজই কিছু না কিছু ঘটে। কোনটা ছেড়ে কোনটা মনে রাখবে। রমিজার চাল বাছা শেষ হয়েছে। ভাত চড়াবে। ও চালের টুকরি নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে হাঁটতে থাকে। যেতে যেতে বলে, দেখবেন আম্মা ও যেন কাঁদে না। কান্না শুনলে আমার বুক ধড়ফড় করে।

ছেলেকে নিয়ে রমিজার বড় ভয়। ও সারাক্ষণ ছেলেটাকে বুকে আঁকড়ে বেড়ায়। সলীম চলে যাবার পর থেকে একদম দুর্বল হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে জোর করে কথাও বলতে পারে না। যেন সলীম চলে যাবার দায়-দায়িত্ব সব ওর। কলীমের মৃত্যু ওকে আরো অপরাধী করেছে।

– ও না গেলে ছোট ভাই বোধ হয় মরতো না, না আম্মা?

– কি জানি মা সবই আল্লার ইচ্ছা।

ওরা ঘর পুড়িয়ে দিতে পারতো। বুড়িকে মেরে ফেলতে পারতো। রমিজাকে ধরে নিয়ে যেতে পারতো। বেয়োনেটের মাথায় গেঁথে নিতে পারতো বুড়ির প্রিয় নাতির শরীর।

— ভেবে দেখেন আম্মা ছোটভাইকে মারার পর ওরা আর এ বাড়িতে আসেনি

বুড়ির কান্না থেমে যায়।

মাঠ থেকে গরু নিয়ে গেছে যাক্‌ গে।

— বড় মায়ার গরু ছিল রে রমিজা!

— কি আর করবেন।

রমিজা হাত পাখা দিয়ে বুড়িকে বাতাস করে। রমিজার সান্ত্বনার কথায় বুড়ি চুপ করে যায় কিন্তু বুকের নিচটা ঝাঁঝরা হয়ে থাকে। ভুলতে পারে না সেই হাম্বা ডাক।

রমিজাকে নিয়েও আতংক দানা বাঁধতে থাকে বুড়ির মনে। ভয়ে কিছু বলতে পারে না ওকে। রমিজাও বোঝে। কিন্তু কিছু বলে না। ওর যৌবন এখন ভয়ের কারণ। যে কোন মুহূর্তে তছনছ করার জন্য দস্যুর দল আসতে পারে। রমিজার চুপসে যাওয়া শুকনো গাল নিষ্প্রভ হতে থাকে দিন দিন। কাজ কর্মে মন নেই। উৎসাহও নেই। উঠোনে শ্যাওলা জমে। আগাছা গজায়। এখন আর লেপে-পুছে তকতকে ঝকঝকে করে রাখে না ঘর-দুয়োর। চুলোয় তিন বেলার আগুন এক বেলায় জ্বলে। ও এখন আর দাউদাউ করে আগুন জ্বালে না। টগবগিয়ে ভাত ফোটে না। বুড়িও বসে বসে সে আগুন দেখে না। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। বুড়ি বাকী একটা গরু নিজেই চরাতে নিয়ে যায়। বাঁশবন পর্যন্ত কিংবা খালের ধারে, এর বেশি যায় না। শেষ সম্বল এই গরুটা কিছুতেই আর মাঠে চরতে পাঠায় না। কখনো বুড়ি নিজেই ঘাস কেটে আনে। খড় যোগাড় করে। হাঁসগুলোকে সন্ধ্যার আগে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দেয়। নিজেরাও খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলে। রাত্রিবেলা আর বাতি জ্বলে না ঘরে। বুড়ি অনুভব করে অভাব ক্রমাগত মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে। শুধু ভয়ে নয় কেরোসিনের অভাবেও বাতি জ্বালানো সম্ভব হচ্ছে না। সারা বছরের ধান ঘরে আছে বলে ভাত জুটছে। এর বাইরেও নিত্যদিনের টুকিটাকি কত কি লাগে সেগুলো আর জোটে না। গতকাল রমজান আলীকে দিয়ে একমণ ধান বিক্রি করিয়েছে। তার থেকে হলুদ, মরিচ, লবণ, তেল, সাবান কিনেছে। কোনদিন শাকভাজি, কোনদিন কাঁচা মরিচ এই তো চলছে। বুড়ি কি করবে কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এর মাঝে রমিজার বাবা রমিজাকে নিতে আসে। সলীম চলে যাবার খবরটা ওরা খুব দেরিতেই পেয়েছে। তাই এতদিন আসেনি। রমিজার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে বলে খুশি হয় বুড়ি। ওর যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তাহলে ওদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। কি জবাব দেবে ওদের প্রশ্নের। তার চাইতে রমিজার যাওয়া ভাল। কিন্তু পরক্ষণে বুকটা আবার দমে যায়। এ শূন্য ঘরে কি করে দিন কাটবে ওর? দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রমিজার বাবার সঙ্গে কথা বলে।

— জামাই যখন নেই মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাই কি বলেন আপনি?

— খুব ভাল হবে। আমিও ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি।

— হ্যাঁ, এত বড় বাড়িতে আপনারা দু'জন মেয়ে মানুষ মাত্র। এতদিন যে কেমন করে ছিলেন ভাবতেও অবাক লাগে। আল্লার অশেষ দয়া বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। যাক যা হবার হয়েছে। এখন ভালোয় ভালোয় মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

রমিজার বাবার কথায় বুড়ির মন খারাপ হয়ে যায়। কোন উত্তর দিতে পারে না। সব কথাই সত্যি। ইচ্ছে করলে রমিজা নিজেও লোক জোগাড় করে চলে যেতে পারত। যায়নি। বুড়ির কি ক্ষমতা আছে রমিজাকে রক্ষা করার? তাই অভিযোগের জবাব নেই। আপত্তি করে রমিজা নিজে।

— আমি চলে গেলে আম্মা একলা কি করে থাকবে বাবা?

— বুড়ি তাড়াতাড়ি বলে, আমার কথা তোর ভাবতে হবে না। আমি ঠিক থাকতে পারব দেখিস। আমি বুড়ো মানুষ কোন মতে দিন ঠিকই চলে যাবে! তোকে নিয়ে আমার যত ভয়।

— কিন্তু তোর এখানে থাকা ঠিক হবে না রমিজা। কলীম থাকলে তবু একটা কথা ছিল। কেউ নেই যখন বেশি সাহস করা ভাল না।

— আশপাশের ঘরে তো লোক আছে বাবা?

— পাড়াপড়শি দিয়ে কি হয়? আপনজন থাকতে হয়।

— কিন্তু বাবা কপালে যা আছে তাই হবে সে যেখানেই থাকি না কেন? তুমি চেষ্টা করলেই কি কপালের লিখন ঠেকাতে পারবে?

— তাই বলে জেনেশুনে তো তোকে আর মরতে দিতে পারি না?

রমিজার বাবার কণ্ঠে রাগ এবং বিরক্তিও। মেয়ের বাচালতায় রুষ্ট।

— সব সময় বড়দের সঙ্গে কথা বলা তোর একটা অভ্যেস হয়ে গেছে রমিজা। আদব কায়দা শিখতে চেষ্টা কর। তোর চেয়ে আমি কম বুঝি না। আমাকে বেশি বোঝাতে হবে না। কি ভাল কি মন্দ সেটা আমি ভালই জানি।

রমিজার বাবা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর মেজাজটা সব সময় একটু চড়া।

— আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না বেয়াই সাহেব। ও ঠিকই যাবে। আপনি এখন আরাম করুন। আমিও চাই না যে ও এখানে থাকুক।

বুড়ি জোরের সঙ্গে কথা বলে। রমিজার কোন যুক্তিই আর খাটে না। ও বাপের জন্যে ভাত আনতে রান্নাঘরে যায়। বুড়ি ঘুমন্ত নাতির পাশে গিয়ে বসে।

রাতে দুজনের কারোই ঘুম আসে না। কিছু দেখা যায় না তবু আঁধারেই চেয়ে থাকে। বুড়িকে ছেড়ে যাবে না বলে জেদ করতে থাকে রমিজা। কান্নাকাটিও করে। বুড়ি কিছু বলতে পারে না। মনটা এখন উদোম মাঠের মত। রমিজাকে ছাড়া এই শূন্য বাড়িটা ওর কাছে কবরের চেয়েও বেশি। কিন্তু উপায় নেই। কলীমের মৃত্যুর মত এ কষ্টও চেপে রাখতে হবে। শুধু নিজের দিকটা ভাবলে তো চলবে না। বাপের মন মেয়ের চিন্তায় অস্থির হয়ে গেছে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল।

— আমি গেলে আপনার বুকটা ফেটে যাবে আম্মা? তাছাড়া ঐ দুষ্টুটাকে ছেড়ে আপনিইবা থাকবেন কি করে? আমার মন চায় না যেতে।

— আচ্ছা এখন ঘুমো। সকালে দেখব।

— বাবাকে আপনি জোর দিয়ে বললেই হবে। বাবা যে কি একটুও কিছু বুঝতে চায় না। স্বার্থপরের মত আমি চলে গেলেই হল আর কি? বাবা সব সময়ই এমন। নিজে যেটা বুঝবে সেটা করবেই করবে। আর কারও কথা শুনতেই চায় না। জানেন আম্মা ছোটবেলায় দেখেছি এই নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রায়ই লোকজনের ঝগড়া হত।

— আচ্ছা এখন ঘুমতো। ছেলেটা আবার উঠে যাবে।

রমিজা চুপ করে যায়। বুড়ি পাশ ফিরে শোয়। ঘুম কি আর আসে? সলীম যেদিন যায় সেদিনও এমনি করে জেগেছিল রাত্রে। কলীম মারা যাবার পর সাত দিনতো চোখের পাতা এক হয়নি। এখন রমিজাও যাবে। ওকে যেতেই হবে। ও যত কথাই বলুক ওর বাবা ওকে ছাড়বে না। জোর করে হলেও নিয়ে যাবে। বুড়ির জন্য ওদের কিসের টান? বুড়ি মরলেইবা ওদের কি আসে যায়? বুড়ির চোখের কোণে জল আসে। ভয়ানক নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। হাত বাড়িয়ে রইসকে কাছে টানে। ও এখনও আছে। ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। কোথাও যাবার ক্ষমতাও নেই। রইস বুড়ির নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারে না। তবুও বুড়ি রইসকে বুকে জড়িয়ে নেয়।

রাত কত হবে কে জানে। পুবদিকের ঘর থেকে মেয়ে-কণ্ঠের চিৎকার আসে। কান-খাড়া করে থাকে দু'জনে। শোনে দুড়দাড় শব্দ। মেয়েটির চিৎকার থেমে গেছে। কেউ যেন ওর মুখে হাত চাপা দিয়েছে। ও গোঙাচ্ছে। বেশিক্ষণ সে শব্দ উঠোনে থাকে না। দ্রুত মিলিয়ে যায়। গোঙানির শব্দ এসে রমিজার বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটায়। ভয়ে ভয়ে বুড়িকে ডাকে।

— আম্মা শুনছেন?

— হ্যাঁ।

— ফুলি না?

— সে রকমই তো মনে হয়। ফুলিই হবে।

— কি হবে আম্মা?

— কি আর হবে। চুপ করে শুয়ে থাক। আল্লাকে ডাক।

এক সময় শব্দ মিলিয়ে যায়। ওরা চলে যাবার অনেক পরও ভয়ে কেউ সাড়া দেয় না। ঝিঁঝিঁটের ডাক জোরদার হয়ে ওঠে। বুড়ি বিছানায় উঠে বসে। পাশের ঘরে রমিজার বাপ কাশে। তাও খুব আস্তে। গলা চেপে চেপে। বুড়ির ইচ্ছে করে দরজা খুলে বের হতে।

— আম্মা উঠলেন কেন?

— বাইরে যাব।

— না। রমিজা চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। কে জানে দু'একজন আবার ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে কি না?

বুড়ি থিতিয়ে যায়। তাই তো? যদি এ ঘরে আসে?

— আম্মা ঘুমান। বাবা বোধহয় জেগে আছে।

রমিজা ফিসফিস করে বলে।

বুড়ি বসেই থাকে অক্ষমতার যন্ত্রণায় ফুলে ওঠে শরীর। এতবড় একটা ঘটনা ঘটল অথচ কেউ প্রতিবাদ করেনি লাঠি নিয়ে বের হয়নি। দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণও না। নির্বিবাদে কাজ সেরে চলে যায় ওরা। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় ফুলিকে। ও কারও কাছে কোন সাহায্য পেল না। ওর জন্যে কেউ ছুটে এলো না আচ্ছা এমন কোন যুবক কি ছিল না যে ফুলিকে ভালবাসে? ফুলিকে যে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতো? ফুলির জন্যে মরে যেতেও পিছপা হতো না? বুড়ির মাথা ভার হয়ে ওঠে। নিথর রাত নীরব, নিশ্চুপ ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে। ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে মুখ ঘঁষে। মনে মনে বলে, আল্লা আমাদের জন্যে মানুষ দাও। শক্তিশালী, সাহসী মানুষ দাও। মানুষ দাও। মানুষ দাও। ভয়হীন, যোদ্ধা, লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষ দাও। হলদী গাঁয়ের মাটি ফুঁড়ে চারদিক তোলপাড় করে ছুটে আসুক হাজার হাজার মানুষ। বুড়ির যে কি হয়। বুড়ি বারবার একটা কথা মনে মনে আওড়াতে থাকে। যতভাবে, যত মিনতিতে চাওয়া যায় আল্লার কাছে সেইভাবে প্রার্থনা করে। এমন তন্ময় হয়ে আকুল হৃদয়ে বুড়ি কোন দিন আর কোন প্রার্থনায় নিমগ্ন হয়নি। বাকী রাতটুকু ওর আর ঘুম আসে না। ভোর হয়ে আসছে। অনেক রাত জেগে রমিজা এখন ঘুমোচ্ছে। বুড়ি দরজা খুলে বাইরে আসে। বুক ভরে শ্বাস নেয়। মনে হয় আজই চলে যাবে রমিজা। সন্ধ্যারাতে ওর কান্নাকাটিতে যে দুর্বলতাটুকু মনে জমা হয়েছিল মধ্যরাতে ফুলির চিৎকার সে দুর্বলতার রেশটুকু কাটিয়ে দিয়ে যায়। ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে বুড়ির চোখের বিরামহীন নোনা জল পুকুরের পানির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

রমিজার বাবা ঘুম থেকে উঠেই মেয়েকে তাগাদা দেয়।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ কর। বেলা ওঠার আগেই রওনা দেব। দুপুর নাগাদ বড়বাজার পৌঁছতে পারলে সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছে যাব। জানিস তো রাত্রিবেলা মধু মাঝি নৌকা বাইতে চায় না।

– কিন্তু বাবা আমি গেলে

– আবার কথা। শুনলাম তো কালরাতের ঘটনা। কানে তো আর তুলা দিয়ে রাখিনি। আজ রাতে যে এ ঘরে আসবে না কে জানে। আমাদের এলাকা এখনো মুক্তিবাহিনীর দখলে। মিলিটারি ঢুকতেই পারেনি। তাছাড়া অত ভেতরে ওরা যেতেও সাহস পাচ্ছে না। যা তাড়াতাড়ি কর।

রমিজা বাবার সামনে থেকে সরে পড়ে। মনে মনে বলে বাবা চিরকাল এমনি একটু শুকনো কথা বলে। মনে মনে যত ভালইবাসুক, একটুও আদর করে কথা বলতে জানে না। বুড়ি ঘর থেকে সব কথাই শোনে খোঁয়াড়ে দুটো হাঁসের ডিম পেয়েছে। তাই ভেজে পান্তা সাজিয়ে দেয় বেয়াইকে। মাটির সানকির ওপর বুড়ির হাত নিথর হয়ে যায়।

রমিজা বুড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, আম্মা?

– দেরি করার কাজ নেই রমিজা। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ভাল বেলা হলে ছেলেটার কষ্ট হবে।

– আম্মা?

— আর কথা বাড়াস না। তোর বাবা ঠিকই বলেছে। আজ রাতে যে এ ঘরে হামলা হবে না কে জানে?

— আপনি একলা কি করে থাকবেন? আপনিও আমার সঙ্গে চলেন?

— আমার জন্য ভাবনা নেই। আল্লা আছে। তারপর বুড়ি ফিসফিসিয়ে বলে, বাড়ি খালি করে সবার যাওয়া ঠিক না। সলীম যদি ফিরে আসে?

বুড়ির কথায় রমিজার কান্না পায়। বাবার ভয়ে শব্দ করে কাঁদতে পারে না। চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। ফুলির ঘটনায় ওর মনও দুর্বল হয়ে গেছে। জোরাজুরি করে থাকবার সাহসটুকু নিজের মনেও খুব একটা নেই।

খালের ধার পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসে বুড়ি। নাতিটা বুকের মধ্যে হাত পা ছুড়ছে। ওকে নিবিড় করে চেপে ধরতেই বুক ভেঙে আসে। তবুও নিজেকে দুর্বল হতে দেয় না। রইস বুড়ির পিছু পিছু হাঁটছে। তখনো সূর্য ওঠেনি। নরম আলো চারদিকে। রমিজা বারবার আঁচলে চোখ মোছে। ওর বুকে ভীষণ কষ্ট। অনেকদিন সলীমের খবর নেই। বুড়িকে একলা ফেলে নিজে স্বার্থপরের মত চলে যাচ্ছে বলে মনটা খচখচ করে। তবুও রমিজাকে যেতে হচ্ছে। ও স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নিয়ে কাদা মাড়িয়ে নৌকায় ওঠে। ছেলেটা কোলে। ও বারবার বুড়ির দিকে হাত বাড়ায়। ওর কাছে আসতে চায়। বুড়ি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। নড়তেও পারে না। নৌকো ছেড়ে দেয়। স্বচ্ছ পানিতে তরতর করে নৌকো এগোয়। রমিজার বাবা কি বলে যেন বিদায় নিয়েছে সেকথা মনে থাকে না। কেবল মাথা নাড়ে। বুড়ি দেখে খালের বয়ে যাওয়া। জোয়ারের সময় এখন। পানি আসছে। দেখে বিক্ষিপ্ত কচুরিপানা বেগুনী ফুল বুকে নিয়ে ভাসে। খালের ওপারে মাঠ। কেবল মাঠ, মাঠের পর মাঠ। খালের বাঁকে নৌকো হারিয়ে যায়। আর দেখা যায় না। বুড়ির মন খাঁ-খাঁ করে। মনে হয় যে মনের ভেতর কেবল মাঠের পর মাঠ। জনমানব নেই। ঐ কচুরিপানার মত বুকের মধ্যে রইসকে নিয়ে বুড়ি ভাসছে। কোথায় যাবে জানে না। এই ভাসাটাই সত্য কেবল। গায়ে গা লাগিয়ে বাতাস বয়ে যায়। কালো ভোমরা একটা বারবার বুড়ির মুখের কাছে উড়ে আসে। রইস মা-র হাত ধরে টানাটানি করে। বাড়ির পথ দেখিয়ে দেয়। যাবার জন্যে ইশারা করে। ও কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। বাড়ি ছেড়ে ও কোথাও যেতে চায় না। কোথাও গেলে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুড়ি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অসহ কষ্টে বুক ফেটে যেতে চায়। কত কষ্টের ধন ও। বুড়ি ভাবে, কষ্ট করে পেয়েছে বলেই বুঝি কষ্টটা বুড়ির নাড়িতে গেঁথে গেছে। ওকে নিয়ে সুখ নেই। সূর্য ফুটিফুটি করছে। বাঁশ বনের মাথার ওপর দিয়ে লাল হয়েছে আকাশটা। রইসের হাত ধরে ফিরে আসে। ফুলিদের ঘরের সামনে লোক জড়ো হয়েছে। ফুলির মা গুনগুনিয়ে কাঁদে। ফুলির বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। সকলের মুখ শুকনো। কি করবে কেউ তা ভেবে উঠতে পারে না। বুড়ি ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। রমজান আলী বলে, বউকে পাঠিয়ে দিলে বুঝি?

— হ্যাঁ।

— খুব ভাল করেছ।

— আমার কি হবে গো রইসের মা?

ফুলির বাবা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। সেই সঙ্গে অনেকে চোখ মোছে। বুড়ির রাগ হয়। কারো বুকে কোন সাহস নেই। আছে কেবল চোখের জল। কি জঘন্য! সকলে জড়ো হয়ে কাঁদতে বসেছে। ফুলির বাপের সঙ্গে কথা না বলে নিজের ঘরে ফিরে আসে। একবার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে যে সবাই এমন শুকনো মুখ নিয়ে বসে থাকলে সারা গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। কিন্তু কাকে বলবে? কেউ কি আছে গাঁয়ে? সব মেরুদণ্ড ভাঙা। কুঁজো হওয়া অথর্ব বুড়ো। বুড়ি একদলা থুতু ফেলে। কারো কাছে দু'দণ্ড বসে মন খুলে কথা বলারও উপায় নেই। ভয়ে চিমসে থাকে।

গত সন্ধ্যায় রমিজা ঘরে ঘরে গিয়ে বিদায় নিয়েছে। সবাইকে বলেছে বুড়ির দেখাশোনা করতে। আগে যারা খোঁজ নেবার দরকার মনে করত না এখন তারা একবার করে আসে। রমজান আলীর ছেলে কাদের আর হাফিজ বাইরের ঘরে ঘুমোয়। ছেলে দুটিকে সারাক্ষণ আগলে রাখে রমজান আলী। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় ওরা। কেবল কৈশোর পার হয়েছে ওদের। অনেক কিছুই বোঝে না। বুড়িকে ওরা ভীষণ ভালবাসে। ফুলিকে ধরে নিয়ে যাবার পর একদিন রাতের অন্ধকারে বুড়ির সামনে গর্জে উঠেছিল দু'ভাই, এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে আমাদের বড় ঘেন্না হয় চাচি। ইচ্ছে করে একদিন পালিয়ে গিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেই।

হাফিজ বলে, বাবা সব সময় ভয় পায় কখন মিলিটারি ধরে নিয়ে আমাদের মেরে ফেলে। আমার মনে হয় মরতেই যদি হয় তাহলে ওদের সঙ্গে লড়েই মরি। তবু তো বাবার মনে গর্ব থাকবে যে তার ছেলে যুদ্ধ করে মরেছে। আপনি কি বলেন চাচি?

ওদের কথা শুনে অভিভূত হয়ে যায় বুড়ি। আবেগে চোখ ছলছল করে।

— তোরা ঠিকই বলেছিস বাবা তোরা এতো কথা ভাবলি কখন?

কাদের আর হাফিজ হাসে

— তোমরা সবাই ভাব আমরা ছোট। স্কুল পেরিয়েছি কেবল।

— ওরে নারে না। তোরা আমার বুকের মানিক। তোরাই তো পারবি। বুড়ো হাবড়াদের দিয়ে কি কিছু হবে?

সে রাতে কাদের আর হাফিজ ঘুমোতে গেলে অনেকদিন পর বুড়ি বুক ভরে শ্বাস নেয়। এক ঘুমে রাত পার হয়ে যায়। বারবার ঘুম ভাঙে না।

মাঝে মাঝে বুড়ি বাঁশবনে গিয়ে দাঁড়ায়। পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি সলীম ফিরে আসে ঐ পথে। দূরের বিন্দুটা যদি কাছে আসতে আসতে সলীম হয়ে যায়। দিন গড়ায়। বুড়ির আকাঙ্ক্ষা আর সত্য হয় না। পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে। দেখে নারকেল গাছের ছায়া আস্তে আস্তে কেমন ছোট হয়ে যায়। হাঁসের দল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পাড়ে। শ্যাওলা সবুজ জল নীতার কথা মনে করিয়ে দেয়। নীতা আর আসেনি। বেঁচে আছে কি না তাও জানে না। ওকে একবার কাছে পেলে হতো। নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো আর সহ্য হয় না। নীতা এখনো হয়তো কণ্ঠে ভালোবাসার গান নিয়ে একখান থেকে আর একখানে ছুটে বেড়াচ্ছে। অনিল বাউল ওকে নতুন জীবন দিয়েছে। বুড়ির দিনগুলো বালিহাঁসের পাখার মতো ধূসর। রাতের তারা আরো নিঃশব্দ বুড়ির চেতনার আকাশ ছায়াপথ যেন।

মাসখানেক পর কাদের আর হাফিজ এসে বুড়ির দরজায় টোকা দেয়। তখনো ভোর হয়নি। আঁধার দ্রুত সরে যাচ্ছে। বুড়ির বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। কি আবার হলো? চকিতে মনে হয় গুলির শব্দ, আগুন, রক্ত, মৃত্যু ইত্যকার বিবিধ ভাবনা। অনেকক্ষণ বুড়ি নড়তে পারে না। মনে হয় কলীমের মা ডাকের তীব্র চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ গুলির শব্দ। বুড়ির কান ঝাঁকিয়ে দেয়। বাইরে ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। দেরি করার সময় নেই। এদিক ওদিক হলে বাতাসও শত্রুতা করতে পারে। কাদের আর হাফিজের কিছু হলো না তো? বুড়ি স্থির হয়ে থাকে। বাইরে ওদের অস্থির কণ্ঠ উচ্চ হয়।

— চাচি, ও চাচি?

সেই ডাকে বুড়ির রক্ত নাড়া দিয়ে ওঠে।

— কিরে এতো রাতে কি?

— আমরা যাচ্ছি।

— কোথায়?

— মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। আমরা যুদ্ধ করব। আপনাকে বলেছিলাম না? কাউকে কিছু বলিনি। শুধু আপনাকে বলে যাচ্ছি। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন।

বুড়ির মনে হয় অবিকল সলীমের কণ্ঠ। এমনি করে সলীম একদিন চলে গিয়েছে। বুড়ির ঠোঁট কাঁপে থর থর করে।

— আমাদের দোয়া করেন চাচী যেন বুক ফুলিয়ে আবার ফিরে আসতে পারি।

ওরা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। বুড়ি অভিভূত হয়ে যায়। ওরা যে সত্যি এতটা সাহসী হয়ে উঠতে পারবে কাছে বসে ভাবতেই পারেনি তা। ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দেবদূতের আলোর মতো ওরা এখন উজ্জ্বল, জিজ্ঞাসা উঁকি দেয়, ফেরেশ্‌তা কি এমনি হয়? এমনি জ্যোতির্ময়? আরো মনে হয় ওদের শরীর থেকে কেমন একটা গন্ধ আসছে। অপার্থিব গন্ধ। সেই মোহিনী গন্ধ বুড়িকে পাগল করে দেয়। ছেলে দুটোর হাত উঠিয়ে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখে। না কোন বিশেষ জায়গা থেকে নয়। চারদিক থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছে।

— কি চাচি? কাদের আর হাফিজ অবাক হয়।

— কিছু না। দোয়া করি— দোয়া করি।

বুড়ির ঠোঁট কাঁপে। আর কিছু বলতে পারে না।

— যাই চাচি। বুকে বল রাখবেন। আপনার কিছু ভয় নাই। সময়-সুযোগ মতো আমরা আসব আপনার কাছে। কোন দরকার হলে বাবাকে বলবেন।

আঁধারের গায়ে মিলেমিশে ছেলে দুটো চলে যায়। বুড়ির মনে হলো ওর চারপাশে এখন আর কোন আঁধার নেই। দু'হাতে আলো ছড়াতে ছড়াতে ওরা ফেরেশ্‌তার মতো চলে গেলো। ওরা এখন স্বর্গের সন্ধানে ব্যস্ত। বুড়িকে মুগ্ধ করে বেঁচে থাকার সাহস দিয়ে গেলো। মনে হয় এখন আর ওর তেমন ভয় করছে না। সমস্ত ভয় ধানের কুঁড়োর মতো ঝেড়ে ফেলে দিল। ওরা চলে যাবার পর নিশ্চিন্তে ঘুম এলো ওর। বিছানায় শুয়ে শুনলো দূরে গুলির শব্দ। এখন নিবিড় ভাবনায় মগ্ন হয়ে বুড়ি প্রার্থনা করে, আল্লা আরো

মানুষ দাও। সাহসী বেপরোয়া মানুষ দাও। বানে-ডোবা হলদী গাঁয়ের মতো মানুষের বানে ভাসিয়ে দাও আমাদের।

বুড়ি আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। কাদের হাফিজের সঙ্গে কথা বলে তবু কিছুটা সময় কাটতো। এখন কথার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে অসহ্য নীরবতাকে চিরে দু'টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে রমিজার মাছ-কাটা বঁটির কথা। খুব ধারালো ছিল বঁটিটা। পোঁচ দিলেই কচ্ করে কেটে যেতো। কিন্তু নীরবতাকে কি কাটা যায়? নীরবতা কেনো মাছের মতো একটা জীবন্ত কিছু নয়? কুটুম পাখি আর ডাকে না। অথবা ডাকলেও বুড়ির মাথায় তা তেমন করে ঢোকে না। হঠাৎ করে দু'একটা শালিক কিচ্‌কিচ্ করে ওঠে রান্নাঘরের চালের ওপর। ওর মনে হয় অলৌকিক কণ্ঠস্বরের মতো। কে যেন অলিখিত ভাষায় ভীষণ কিছু পাঠ করে যাচ্ছে। বুড়ি তা বুঝতে পারছে না। অথচ ঐ শব্দটুকুর জন্যে যেন কতো কালের প্রতীক্ষা বুড়ির। দূরে যখন কোথাও বোমা ফাটে, যখন পুল ভেঙে যায় তখন বুড়ির নিশ্বাস দ্রুত হয়। ঐ শব্দগুলো মনে হয় নিজের অস্তিত্বের চাইতে বেশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়েও মূল্যবান।

তিন-চারদিন পর দক্ষিণ দিকের ঘরের ছেলেটি এসে বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

— খালা দোয়া কর মুক্তিবাহিনীতে যাচ্ছি।

বুড়ি দোয়া করে। হাসিমুখে বিদায় দেয়। মনে মনে আশ্বস্ত হয়। এক দুই করে অনেক ছেলে চলে গেছে। আল্লা বুড়ির কথা শুনছে। আল্লা বুড়িকে মানুষ দিচ্ছে। স্রোতের মতো ওরা আসছে। চারপাশের ছেলেগুলোর ভেতর এতো তেজ ছিল তা একবারও টের পেলো না কেনো? তাহলে বুড়ির উপলব্ধিতে কোথাও কি কোন ফাঁক ছিল? দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলে যাওয়া ছেলেটির গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও পিছু তাকায় না। কোনদিকে খেয়াল করে না। সামনে লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো হলদী গাঁ এখন ঐ ছেলেগুলোর শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয় বুড়ির। বুড়ি কোন কাজেই আসে না। ওদের মতো অমন করে ছুটে বেরিয়ে পড়তে পারে না। ওর শক্তি নেই, সে বয়সও নেই। অথচ বুড়ি কাজ চায়। হলদী গাঁ-র জন্যে কিছু করতে চায়? হলদী গাঁ-যে বুড়ির প্রাণের চাইতেও প্রিয়।

মনে হয় নীতাও একটা কিছু করছে। অন্তত গানে গানে মন্ত্র ছড়াচ্ছে। ওর গানের গলা এখন বোমা হয়ে অসংখ্য লোকের বুকের পুল দুম করে ফাটিয়ে দিচ্ছে। নীতা কাজ পেয়ে মহান হয়েছে। আর বুড়ি? পরক্ষণে চোখ পড়ে রইসের দিকে। সতেরো বছর বয়স ওর। দেহটা বেশ সুঠাম। ওর বেড়ে ওঠাতে কোন ফাঁক নেই। কোন ঘাটতিও নেই। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। ও বাম হাত দিয়ে একটা মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছে। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাচ্ছে। চারদিকে বোকার মতো তাকাচ্ছে, কখনো হাততালি দিয়ে হাসছে।

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কি হবে এই ছেলে দিয়ে? ও ভাইয়ের মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে পারেনি। দেশ জুড়ে যে এত বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। বুড়ির ভীষণ কান্না

পেলো। ও তো পারতো ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। ও তো পারতো জনযুদ্ধের অংশীদার হতে। মুক্তিবাহিনীর একজন হয়ে বেপরোয়া যোদ্ধা মানুষ হতে। বুড়ির চকিতে মনে হলো এ ছেলের বেঁচে থেকে কি লাভ? এ ছেলে না থাকলেই ভাল প্রতি মুহূর্তে এতোবড় একটি ছেলের অসহায় পঙ্গুত্ব বুড়িকে যন্ত্রণার নরকে দগ্ধ করে। পর মুহূর্তে মন ছটফটিয়ে ওঠে। দৌড়ে আসে বারান্দায় রইসের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখের পানিতে ভিজিয়ে দেয় মাথা, নাক, গাল। রইস বিরক্ত হয়। বুড়িকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। ঠেলে ফেলতে চায়। বুড়ি তবুও যখন ছাড়ে না তখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিচে নেমে যায়। যেন মায়ের এ ধরনের আচরণ সহ্য করতে রাজি নয়। ও কাচারীঘরের দিকে হাঁটতে থাকে। অকারণে হাঁসগুলো তাড়ায়। বাঘার পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দেয়। বুড়ি ওর ওপর রাগ করতে পারে না। ওর ওপর রাগ করলে সেটা নিজের ওপর এসে পড়ে। কষ্ট হয়। কলীমের মৃত্যু কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে হৃৎপিণ্ডে। কয়েকজন দানব আকারের মানুষের ছায়া বুড়িকে গ্রাস করে। ক্ষণিকের জন্যে ওর নড়ে ওঠার ক্ষমতা রোধ হয়ে যায়।

কদিন পর কাদের আর হাফিজের বাবা রমজান আলীকে ধরে নিয়ে গেলো মিলিটারি। দু'তিন দিন চাপা ছিল খবরটা। কিন্তু বেশিদিন রাখা গেলো না। কিভাবে যেন জানতে পারে ওরা। তাই মারমুখী হয়ে ছুটে এসেছে। ওরা মারপিট করলো বাড়ির লোকদের। বুড়ির ভাগ্য ভাল যে ওর ঘরে আসেনি। কলীমকে মেরে যাবার পর ওরা আর ঘরে ঢোকেনি। ও ঘরে বসে শুনেছে পুরুষদের আর্তচিৎকার, মেয়েদের কান্না, ছোটদের হৈচৈ। বুড়ি শুধু বসে বসে আল্লাহর কাছে তার নিজস্ব প্রার্থনা করেছে। মানুষ দাও। মানুষ দাও। ওরা চলে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেলে বুড়ির চকিতে মনে হয়, কে এ কাজটা করলো? ও কি একবারও বুঝতে পারেনি যে বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজের সঙ্গেই করলো? করলো নিজের পায়ের তলার মাটির সঙ্গে। এ মাটির রঙ যে চেনে না সে মাটিতে পা রাখার অধিকার তার নেই। বুড়ির ইচ্ছে করে সে বিশ্বাসঘাতকের টুঁটি চেপে ধরতে। মনসুরের কথা মনে হতেই রক্ত ছলকে ওঠে। সলীমের কথা ও-ই বলেছিল। দু'দিন আগে জলপাই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মনসুর ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, রমজান আলীর ছেলে দুটাকে আর দেখছি না যে?

– ওদের নানাবাড়ি গেছে।

– তাই নাকি?

– হ্যাঁ, ওদের নানার খুব অসুখ।

– ওদের মা গেলো না?

– ওদের মা'র তো শরীর খারাপ। ভরা মাস যে।

– অ।

মনসুর হেসেছিল?

– তোমার এতো খোঁজে দরকার কি বাপু?

– না, এমনি।

মনসুর আর দাঁড়ায়নি। হনহন করে মেঠো পথে নেমে গিয়েছিল। ওর কালো ছাতি অনেক দূরে মিলিয়ে যাবার পরও বুড়ির মনে হয়নি যে মনসুর কথাটা আদৌ বিশ্বাস করেনি। উল্টো আরো সাতকাহন গেয়ে লাগিয়েছিল। এখন বুড়ি নিজের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। মনসুর তুই একটা বেজন্মা। তোর মা-বাপের জন্মেরও ঠিক নাই। তুই যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস ওরা তোর কে? তুই ভুলে গেলি তোর চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটির কথা? তোর সঙ্গে একই জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষগুলোর কথা! এ মাটি এখনো তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না কেন মনসুর!

বুড়ি আরো শক্ত কথা বলতে চায়। কিন্তু যুৎসই কিছু মুখে আসে না। শুধু ক্রোধ বাড়ে- ঘৃণা বাড়ে। বুড়ির মুখে কথা আসে না। শুধু ক্রোধ বাড়ে আর ঘৃণা বাড়ে। শুধু ক্রোধ আর ঘৃণা। শেষে আর একবার মুখ খোলে, মনসুর তোর আর আমার ভাষা এক, মাটি এক এ লজ্জায় আমি বাঁচি না যে! ও সুপোরি বাগানের নিরিবিলি ছায়ায় আসে। কলীমের কবরের কাছে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা বড় শ্যামল শীতল। বুড়ির ভীষণ প্রিয়। এখানে এলে ও নিজের দুঃখের কথা ভুলতে পারে। তখন ওর সাহস বাড়ে। বুকের দিগন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। মহাসমুদ্রের মত অনবরত গর্জনে উন্মাতাল হয়ে ওঠে বুড়ির হৃৎপিণ্ড।

পরদিন রমজান আলী ফিরে এল। গায়ে জ্বর। সারা শরীরে ব্যথা। মারের চোটে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। বুড়ি দেখতে গিয়েছিল। ওকে দেখে রমজান আলী কিছু বলেনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বুড়ি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। রমজান আলীর বৌ গায়ে তেল মালিশ করে দেয়। ও উঠে যেতেই বুড়ি কাছে আসে।

– রমজান ভাই কষ্টটা মনে না গায়ে?

– গায়ে।

রমজান আলী স্থির কণ্ঠে বলে।

– ওরা একটা ভাল কাজে গেছে রমজান ভাই।

– সে আমি জানি।

– ওদের তুমি দোয়া করো।

এতক্ষণে রমজান আলী সামান্য হাসে।

– রইসের মা কলীম গেছে তবু তুমি ভাঙনি।

বুড়ি কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে সরে আসে। কাদের আর হাফিজ চলে যাওয়ার দরুন রমজান আলী মার খেয়েছে। এজন্যে ওর মনে কোন কষ্ট নেই দেখে বুড়ি আশ্বস্ত হয়। এটুকুই চেয়েছিল। যত কষ্টই হোক সইতে হবে। ওদের যাওয়ার পথ খুলে রাখতে হবে। সেটা বন্ধ হতে দেয়া যাবে না।

গোয়াল থেকে গরু বের করে এনে বুড়ি বাঁশবনে এসে বসে। অনেকদিন পর আজ গরুটা ছেড়ে দেয়। একটু উঁচুকণ্ঠেই বলে, তুই আজ তোর খুশি মত চরে বেড়া। তোকে আজ বাঁধবো না। বুড়ি লটকন গাছের গুঁড়িতে হেলান দেয়। রমজান আলীকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায়। মার খেয়েছে তবু বলেনি যে ওরা কোথায় গেছে। শুধু ওরা

দু'জন অক্ষম মা ছেলে হলদী গাঁ-র জন্যে কিছু করতে পারছে না। গোটা গাঁ জুড়ে তোলপাড় হয়ে বয়ে যায় ঘটনা। কত নিত্যনতুন খবর আসে। খবর আসে মুক্তির ছেলেদের কৃতিত্বের। খবর আসে দলের হত্যার। কখনো কোন প্রিয় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর। শব্দ আসে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারের। প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাওয়া ডিনামাইটের, বোমার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছেলেদের হাতের রাইফেল হয়ে যেতে, ডিনামাইট হয়ে যেতে, বোমা হয়ে যেতে। ঐ রকম প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিয়ে যদি একটা পুল উড়িয়ে দিতে পারতো? পারতো যদি মিলিটারি ক্যাম্প ধ্বংস করে দিতে? অসংখ্য মৃত সৈনিকের বুকের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মত বয়ে যেতে? মাঝে মাঝে মনে হয় যে একটা মেশিনগান হয়ে গেছে। ছেলেদের কাঁধে সওয়ার হয়ে কখনো ছুটে যাচ্ছে, কখনো পিঠের ওপর চড়ে বুকে-হাঁটা ছেলেদের সঙ্গী হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে পাট ক্ষেতে শুয়ে পঁচিশ বছরের দুর্দান্ত ছেলেটির স্বাধীনতার স্বপ্ন হয়ে গেছে। বুড়ির ইচ্ছে করে সেই যৌবন ফিরে পেতে সেই আশ্চর্য যৌবন যা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে নাগালে পাওয়ার জন্যে দুর্বিনীত হওয়া যায়। মাঝে মাঝে শিরশির করে উঠে বুড়ির অনুভূতি। কে যেন ওর পা ছুঁয়ে ভয়ানক শপথ করছে। কারা যেন বুড়ির বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর তখনই নাড়িতে গেঁথে থাকা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। গরুটা নিজের কাছে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। ও দ্রুত চলতে গিয়ে বাঁশের মুথায় হোঁচট খায়। বুড়ো আঙুলের নখ উল্টে যায়। রক্তাক্ত পা চেপে বুড়ি বসে পড়ে। হাতের কাছে শিয়ালমুথরি পাতা ছিল। চিবিয়ে লাগিয়ে দেয়। ব্যথায় টনটন করে। পা টেনে উঠে দাঁড়ায় বুড়ি। গরুটা কাছেই ছিল, বেশিদূর যায়নি। দড়িটা হাতের মুঠোয় ধরে ঘরে ফিরে আসে। কোনরকমে ওটাকে সজনে গাছের সঙ্গে বেঁধে বারান্দায় চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে।

মাথা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে। ব্যথা বাড়তেই থাকে। হঠাৎ মনে হয় কষ্টটা ওর ভালই লাগছে। উপলব্ধি করলো কখনো নিজের শরীরের ব্যথা যন্ত্রণার বদলে আনন্দ হয়। নইলে তরুণ টগবগে ছেলেগুলো গুলী খেয়েও হাসিমুখে মরতে পারতো না। ওদের বুকের সুখভরা পদ্মদীঘি স্বাধীনতার থৈ-থৈ জলে উথাল হয়। বুড়ি রইসের দিকে তাকায়। ও আপন মনে হাসছে। রইস ওদের কারো মত নয়। ওর বুকে স্বাধীনতার পদ্মদিঘী নেই। পদ্মের গন্ধে মাতাল হয়ে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দুর্দমনীয় বেগে ছুটে যায় না। ওর মুখের দিকে চেয়ে বুড়িকে এক অপরাধবোধে পেয়ে বসে। মনে হয় হলদী গাঁ ওদের চায় না। ওরা হলদী গাঁ-র জন্যে কিছুই করতে পারছে না। ওরা মা ছেলে কেবল খায় আর ঘুমোয়। আর কোন কাজ নেই। হলদী গাঁ-র জন্যে ওদের যত ভালবাসাই থাকুক না কেন সব অর্থহীন। কলীম মরে গেছে, সলীম যুদ্ধ করছে। বুড়ির মনে হয় এটুকুই যথেষ্ট নয়। কিছু করা দরকার। আরো বড় কিছু। অনেক বড় ত্যাগ। ঐ যুদ্ধরত ছেলেগুলোর মত প্রাণের মায়া তুচ্ছ করা ত্যাগ। নিঃস্বার্থভাবে ছুটে গিয়ে বুক পেতে দেয়া। ঘুরে ফিরে আবার ভাবনা এসে আক্রমণ করে। হলদী গাঁ বুঝি ঘৃণা করছে। অকেজো, অকর্মণ্য বলে ঘৃণা। ঐ বাঁশবন, খালের ধার, শিমুলতলা, স্টেশনের রাস্তা সবখান থেকে ঘৃণার ধুলো উড়ছে। সমস্ত শরীর ধুলোয় ধূসরিত। বিশ্রী নোংরা

চারদিকে। বুড়ির শরীর কেমন করে নখের ব্যথা ভুলে গিয়ে উঠে বসে। হাঁস উঠোনে নেমে গেছে, বাঘার পাশে বসে ওর লেজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

খবর আসে অনেক। যুদ্ধ জোর বাড়তে থাকে। রমজান আলীর ঘরে বসে কখনো চুপি চুপি স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে ওরা। বুক ভরে ওঠে গর্বে, আনন্দে। রমজান আলী 'চরম পত্র' শোনার জন্যে উন্মুখ থাকে। বুড়ি সব কথা বুঝতে পারে না; তবু শুনতে ভাল লাগে। কি যেন যাদু আছে ঐসব কথায়। ইদানীং দিনের বেলাও গুলি-গোলার শব্দ ভেসে আসে। একে দুয়ে গাঁয়ের অনেক ছেলে চলে গেছে। মনসুরের মত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের ভয়ে ওরা মুখে বুড়ো আঙ্গুল পুরে চুপ করে বসে থাকেনি। মনসুরের মত লোকদের বুকের জ্বালা বাড়িয়েছে। বুড়ির মনে হয় মনসুররা আর কয়জন? ওদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। কিন্তু সলীমরা অনেক। সলীম একটি ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। ও ভাল আছে। মাকে নির্ভাবনায় থাকতে বলেছে। মায়ের কাছে অনেক ভালবাসা জানিয়েছে। আরো বলেছে, একদিন ও স্বাধীন দেশের ছেলে হয়ে মার সামনে এসে দাঁড়াবে। বুড়ির চোখে পানি আসে। আনন্দ হয়। সলীম যুদ্ধ করছে। এমন ছেলেই তো চেয়েছিল। অহংকারে মাথা উঁচু করে বিজয়ীর বেশে যে এসে দাঁড়াবে ওর সামনে। শুধু কলীমের নিরুপায় মৃত্যু ভুলতে পারে না। ও কোন সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিয়ে মরতো। শুধু নাড়িতে গেঁথে থাকা কষ্ট এখন আর তেমন কাঁদায় না। সাহস ভেঙে দেয় না। বুড়ির মনে জোর ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে গুলির শব্দে বুড়ির অসহ্য নীরবতা চনমনে ভরপুর হয়ে ওঠে। জল টুপটুপ নদীর মত মনে হয় নিজেকে। যে নদী কানায় কানায় ভরা। যে নদীর মাঝে কোন চর পড়েনি। বাঁশবনের মাথার উপর দিয়ে সাদা বক উড়ে যায়। শরতের আকাশ উজ্জ্বল নীল। বুড়ি খালের ধারে যায়। খালপাড়ের সাদা কাশফুল দেখে। কাশফুল তুলোর মত ধবধবে নয়। এর মধ্যে অন্য রঙের আভা আছে। মনে হয় তুলোই ভালো। শিমুলের ডালে কিচির-মিচির করে চড়ুইয়ের ঝাঁক। কখনো খাকী পোশাক-পরা লোকগুলো রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ির আর ভয় করে না। ওরাও ওকে কিছু বলে না। বুড়ি ভাবে, ওরা ওকে আমল দেয় না। ওদের শত্রুর মধ্যেই গণ্য করে না। বুড়ি ডিমার শাক খুঁটতে খুঁটতে হাসে। ওরা বুঝতে পারে না বুড়ি বুকের মধ্যে কি বিরাট এক আগুনের পিণ্ড সাজিয়ে রেখেছে। মুহূর্তে ওটা দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে। ভিনদেশী দনিবগুলো কখনো দেখেনি যে শুকনো বাঁশপাতা কেমন দাউ দাউ করে জ্বলতে পারে। নদীনালা খাল-বিল জলাভূমির দেশ হলেও এর চরিত্রে পাথুরে কাঠিন্য আছে। মানুষগুলো কেবল স্যাঁতসেঁতে জলাশয় নয়। সেখানে আগুনের সঙ্গে একটা সহজাত সম্পর্ক আছে।

আজকাল কেবলই ইচ্ছে করে রমিজার মাছ-কাটা বঁটিটা দিয়ে সব কচু-কাটা করে ফেলতে। তখন অনেক রক্তের কথা মনে হয়। রমিজার মাছ-কাটা বঁটির গা বেয়ে তাজা ফটফটে মাছের রক্তের স্রোত নামে। কলীমের রক্তের রেখা মাটির বুকে শুষে যায়। মার-খাওয়া রমজান আলীর পিঠে রক্তের দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে থাকে। জবাই করা

কবুতরটা বুড়ির উঠোনে লাফায়। ওর পায়ের আঙুল উপড়ে গিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। বুড়ির মনে হয় কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়।

হলদী গাঁ-র শরৎ এবার অন্য রকম। ওর মনের রঙের মত বদলে গেছে ঋতু। ভরদুপুর ঝিমোয় না। পড়ন্ত বিকেল ক্লান্ত না। রাতের আঁধার বারুদের গন্ধের মৌতাতে মাতাল। হলদী গাঁ-র নিশুতি রাত কবে ফুরিয়ে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা, জোনাক-জ্বলা রাতগুলো এখন ফুটফাট ফাটে। তপ্ত কড়াইয়ে খই ফোটার মত ফেটে ছিটকে ওঠে। রাতের হদিস খুঁজতে খুঁজতে বুড়ির চোখ এখন উৎসবহীন জেগে থাকে না। মনে হয় রাতগুলো এখন পাখা মেলে উড়ে যায়। শুধু আঁধারে নিঃশেষ হয় না। ওর জন্যে এক টুকরো সলতের আলো জ্বেলে রাখে। সে আলোর রেখা ধরে ও হলদী গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে। যন্ত্রণা পাশে রেখে বুকের পদ্মদীঘি ভেসে ওঠে।

বুড়ির খোপের মোরগগুলো যেন এখন অন্যস্বরে ভোরের কথা ঘোষণা করে। ও বিছানায় শুয়ে শোনে। রইসের গায়ে কাঁথা টেনে দেয়। ওর জন্যে বুকের ভেতর মমতা উথলে উঠে। এখন রইস বুড়ির অনেক কাছের। রক্তের মধ্যে রইসের উত্তাপ। প্রতি রোমকূপে রইসের নিঃশ্বাস। ওর মুখ থেকে ঝরে পড়া লালা বুড়ির চেতনার গ্রন্থি নিবিড় করে। অনেক দূরে ফেটে-পড়া পুলের শব্দ ওর হৃদয়ে জেগে থাকে। বুড়ি বোঝে না কেন ছেলেটা এমন করে টানছে! ওকে যত্ন করতে ভাল লাগে। গোসল শেষে চুল আঁচড়ে দিতে ভাল লাগে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাত খাওয়া দেখতে ভাল লাগে। হাঁ করে ঘুমিয়ে থাকা চেহারাটা বুড়ির চোখে অপরূপ। রইস যেন নতুন করে আবার বুড়ির কোলে ফিরে এসেছে। ওর শৈশবের দিনগুলোয় বিস্ময়, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, নতুন মাতৃত্বের স্বাদ যেমন বুড়িকে মাতিয়ে রাখতো এখনো ঠিক তেমন লাগে। রইসও বুড়িকে তেমন করে আঁকড়ে ধরেছে। ও প্রায়ই রইসকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। ও সঙ্গে থাকলে বুড়ির অনুভূতি পাল্টে যায়। মনে হয় আছে, আমারও কেউ আছে। এমনি একটা বোধ ওকে ঘিরে থাকে। ও অসহায় হয় না কিংবা দারুণ একাকিত্ব বিমর্ষ করে রাখে না। খাকি পোশাক পরা লোকগুলোর সৈনিক চেহারা মুছে যায়। বুড়ির হলদী গাঁ তার নিজস্ব চেহারায় ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এখানে কোন ভিনদেশীর আক্রমণ নেই, মৃত্যু নেই, রক্ত নেই, কান্না নেই। বুড়ির বুক চেপে আসে। আসলে তা নয়, শরতের হলদী গাঁ আশ্বিনের শিশির গায়ে মেখে দুপুর রাতের ছেলেগুলোর স্বপ্ন হয়ে যায়। বুড়িও সে স্বপ্নের অংশীদার।

কখনো কখনো বুড়ি রইসের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে।

– ও রইস, রইস তোর খুব কষ্ট না রে? তোর বুকে অনেক কথা, মুখে নেই। তুই কথা বলতে পারিস না। আমারও অনেক কষ্ট, আমি যুদ্ধ করতে পারি না।

বোবা রইস হাঁ করে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

– কি দেখছিস কি? কথা বলার জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, আমারও এমনি হয়। কাউকে কিছু বোঝাতে পারি না। তুই যেমন আমিও তেমন। আমিও তোর মত হাবা বোবা অকেজো। হলদী গাঁর জন্যে কিছু করতে পারলাম না।

রইস গোঁ গোঁ শব্দ করে। মা'র হাত ধরে টানাটানি করে। পথে পথে দাঁড়াতে ওর ভাললাগে না। বাড়ি যাবার জন্যে তাগাদা দেয়। বুড়ি শিমুলতলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পথ-ঘাট শুকনো খটখটে। বাতাসে হিম হিম ভাব। কার্তিকের শুরু হয়েছে। শিমের মাচায় বেগুনি ফুল ঝকঝক্ করে। রইস একটা কঞ্চি দিয়ে ঘাস লতাপাতা খোঁচাতে খোঁচাতে পথ চলে। হঠাৎ করে বয়ে যাওয়া উত্তুরে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় বুড়ি। বাতাসটা গায়ে মেখে নিয়ে বলে, শীত আসছে রে রইস, শীতের রাতে ছেলেগুলোর বড্ড কষ্ট হবে। কেমন করে যে কি করবে ভেবে পাই না।

রইস বুড়িকে ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। ও বাড়ির কাছাকাছি চলে গেছে। বুড়ি দাঁড়িয়ে শিমের বেগুনি ফুল দেখে। মাচার ওপর ফিঙে ঝোলে। ক্ষেতে লাল শাকও হয়েছে প্রচুর। ওর মন কেমন করে। কলীম লাল শাক খুব পছন্দ করত। রইস হওয়ার আগে কলীম ওর সঙ্গী ছিল। বুড়ির হাত ধরে লাল শাক তুলতে যেত, বুড়ির সঙ্গে মারবেল খেলত। বড় হওয়ার পর বুড়ি খলুই জাল গুছিয়ে না দিলে মাছ ধরতে যেত না। বুড়ি তাড়াতাড়ি হেঁটে ঘরে চলে আসে। ভাত রাঁধতে হবে। রইসের খিদে পেয়েছে। আজ হাঁড়িতে পান্তাও নেই। বারান্দার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। পানি চিকচিক্ করে চোখের কিনারে। জল থৈ-থৈ নদী এখন চোখ দুটো, নদীর তীরে কাশবন। কাশবনে সাদা বক। সাদা বকের ধবধবে পালক। বুড়ির মন এখন সাদা বকের ধবধবে পালক।

রমিজা খবর পাঠিয়েছে। ওরা ভাল আছে। ছেলেটা খুব হাশিখুশি হয়েছে। কান্নাকাটি নেই। সারাদিন ধুলোয় খেলে। কথা বলার চেষ্টা করে। রমিজা অনেক পিঠে দিয়েছে বুড়ির জন্যে। মাছ পাঠিয়েছে, ডিম পাঠিয়েছে। কিন্তু পিঠে কে খাবে? পিঠে-পাগল সলীম তো আর নেই। প্রতিদিন এক একরকম পিঠে তৈরি হত সলীমের জন্যে। পিঠে না হলে ও রমিজাকে বকাবকি করত। বুড়িকেও ছাড়ত না। সলীম এখন যুদ্ধ করছে। পিঠে খাওয়ার কথা এখন আর ওর মনে নেই। বিরাট সুখের প্রত্যাশায় ওরা ছোটখাটো সব সুখের কথা ভুলে গেছে। বুড়ির মনে হল রমিজা কি সলীমকে মনে করে এত পিঠে পাঠিয়েছে? বেচারী! কোন খবরই পাচ্ছে না সলীমের। ও হয়ত ভাবছে, কোনদিন রাতের অন্ধকারে সলীম যদি চুপিচুপি ঘরে ফেরে? এখানে থাকতে রমিজা এই প্রত্যাশা করতো। এখানে থাকলে তবু ওর ভাল হতো। না হয়ত খুব ভাল হত না। কিইবা ভাল হতো। এখানে ঐ লালমুখো সৈনিকগুলো যেমন উৎপাত করে! কত লোক সরে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে। দক্ষিণের প্রত্যন্ত সীমানায়। বুড়ির বাড়ি থেকে সিকি মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প। ওরা যখন যা খুশি তা করে। হুটপুট করে এসে হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল যেমন নিয়ে যায়, তেমন ডবকা মেয়েরাও যায় রশি বেঁধে টেনে নেয়া ছাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে। বুড়ি এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে রমিজা দূরে আছে ভালই আছে। কলীমের মৃত্যু সহ্য হয়েছে। কিন্তু চোখের সামনে রমিজার কোন দুর্ঘটনা সইবে না। ও ভাল থাকুক। ভাল।

কার্তিকের হিম হিম ভাব আর নেই। ফিনফিনে নীল কুয়াশা গাঢ় হয়েছে। অঘ্রাণের শেষ। আর দু'একদিন বাকি। জোর শীতের দাপট চারদিকে। মাচানের ওপরের

ঝাঁকেঝাঁকে বেগুনি ফুল সবুজ শিম হয়ে গেছে। মাছরাঙার শরীর চকচক করে। টুনটুনি উড়ে বেড়ায়। দেখতে ভাল লাগে। দেখতে দেখতে মনে হয় সবসময় শীতকালে রইসের শরীর ভাল হয়। এবারও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। মুখটা ভরা পুকুরের মত টলটলে। টানা বড় বড় চোখ জোড়া লাল শাপলার পাপড়ির মত। ও বেশ ছটফটে হয়েছে। ঝিম-ধরা ভাব নেই। ওকে দেখে বুড়ির দিন মুখর হয়ে ওঠে। বুকের দীঘি থৈ-থৈ আনন্দে বেসামাল হয়। ওর পরিবর্তন মনে করিয়ে দেয় যে ওর মধ্যেও একটা মুখর প্রাণ আছে। কিন্তু আসলে ওর কোন ভাষা নেই। শীতে ও প্রাণের জোয়ারে প্লাবিত হয়। বাহ্যিক আচরণে তা জানান দেয়। ও আরো দামাল হোক, চঞ্চল হয়ে উঠুক। বুড়ি সারাক্ষণ এই প্রার্থনা করে। রাত্রিবেলা ওর পাশে শুয়ে থেকে ওর সঙ্গে অনেক কথা বলে। কখনো নিজের জীবনের গল্প করে। রইস ঘুমিয়ে গেলেও বুড়ি বলতে থাকে। বলতে একটুও ক্লান্তি নেই। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অঘ্রাণের কুয়াশার মত খুশির ফিনফিনে নীল পর্দা হয়ে থাকে মনটা।

সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। একদম আষাঢ়ে বৃষ্টির মত একটানা। ঘনকালো মেঘ আকাশে। চারদিক অন্ধকার করে নেমেছে। রইস উঠে পান্তা খেয়ে আবার শুয়েছে। বুড়ি ভিজে ভিজে হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় খুলেছে। গোয়াল পরিষ্কার করেছে। গরুকে খড়-ভূষি দিয়েছে। আর এসব করতে করতে বুড়ির মনে অনেকদিনের পুরোনো এক গান বারবার গুনগুনিয়ে উঠছে। বুড়ির যে প্রচণ্ড শীত করছে একথা একবারও মনে হয় না। মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে আঁচলটা নিংড়োতে নিংড়াতে বুড়ি যখন বারান্দায় উঠে আসে তখন নীতা বৈরাগিণী ঢোকে। বুড়ি বিস্ময়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, সই?

নীতা কথা বলে না। ভিজে শরীর নিয়ে বারান্দার ওপর উঠে আসে।

– এমন ঝড়-বাদল মাথায় করে কোথা থেকে এলি?

নীতা কথা বলে না। দু'হাতে মুখ ঢাকে।

– তুই কাঁদছিস সই? ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আগে কাপড় ছেড়ে নে?

নীতার পোঁটলাটা আজ ওর সঙ্গে নেই। বুড়ি ঘর থেকে শুকনো কাপড় এনে দেয়।

– নে ভিজে কাপড় ছাড় আগে, তারপর তোর সব কথা শুনব। আজ আমার মন খুশি খুশি, তোকে পেয়ে আরো ভাল লাগছে। বৃষ্টি ভরা এই দিনটা দু'জনে গল্প করে কাটিয়ে দেব। কতদিন যে মন খুলে কথা বলার মানুষ পাইনি।

নীতা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হি হি করে কাঁপে। অনেকটা পথ ভিজতে ভিজতে এসেছে। ঠাণ্ডা ওর হাড্ডির গায়ে লেগেছে। বুড়ি মালসায় করে কয়লা ধরিয়ে আনে।

– হাত-পা গুলো সেঁকে নে সই।

– আগে আমাকে ভাত দে। দু'দিন ধরে মুড়ি আর পানি ছাড়া কিছুই খাইনি।

– পান্তা আছে মরিচ পুড়িয়েছি। আগুন পোহাতে পোহাতে খাবি চল।

দু'জনে ভাত খায়। নীতার কিছু একটা হয়েছে বুড়ি তা বোঝে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না। ভয় হয়। এমন কিছু হয়তো শুনবে যে বুড়ির মন ভার হয়ে যাবে। সারাটা দিন খারাপ লাগবে।

– তোর এখানে আমি দুটো দিন থাকব সই।

– কি ভাগ্যি! আগে তো যোটেও রাখতে পারিনি।

নীতার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

– তুই থাকলে আমার ভালই লাগবে। একা একা আর দিন কাটে না।

বুড়ি খেয়েদেয়ে চিকন সুপোরি কাটে। অনেকদিন পর ও চিকন সুপোরি কাটতে বসেছে। নীতা মালসার ওপর হাত পা গরম করে।

– বৃষ্টি তো নয় একদম হাড়-কাঁপানো সুচ।

বুড়ি অন্যমনস্কের মত বলে, তোর অখিল বাউল কৈ সই?

– মরেছে।

– কি হয়েছিল?

– বুকে গুলি খেয়েছিল।

– সই!

বুড়ি আঁৎকে ওঠে।

– আমার আখড়া আর নাইরে সই, যেখানে আমি ফিরতে পারি। সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।

বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না। সুপোরি কাটাও হয় না। নীতা চোখে আঁচল চাপা দিয়েছে।

– কেন যে আমাদের আখড়া পুড়িয়ে দেয়া হলো, লোকগুলোকে গুলি করা হলো, বাকিদের ধরে নিয়ে গেল তার আমি কিছুই বুঝি না সই। তবু যদি ঐ ভিনদেশী কুত্তাগুলা করতো তাও প্রাণে সইতো। করেছে সব আমাদের জাত ভায়েরা। যাদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা চলাফেরা। এই লজ্জা আমি কোথায় রাখি সই? অখিল বাউল মরেছে সেই দুঃখের চাইতেও বেশি বাধে যে ওকে গুলি করেছে আলী আহমদ। কিসে যেন বুকটা কামড়ে ধরে। কারো সঙ্গে কথা কইতে পারি না। যারা এমন কাজ করলো ওদের সবাইকে আমরা চিনি। আমাদের মুখের ওপর থুতু দিয়ে বলেছিল, আমরা নাকি দেশের শত্রু। এই শুনে অখিল বাউল গর্জে উঠেছিল, মিথ্যে কথা। মাটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। দেশের জন্যে গান লিখেছি।

গান? হো হো করে হেসে উঠেছিল ছোড়াগুলো। বিশ্বাস কর সই ন্যাংটা অবস্থা থেকে ওদের আমি বড় হতে দেখেছি। যুদ্ধ লাগার আগেও ওরা আমাদের আখড়ায় আসতো গান শুনতে। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, গান লিখেছো যাদুধন, ঘুঘু দেখনি, এইবার দেখ, এই নাও গান লেখার পুরস্কার!

– দুম করে মেরে দিল। লুটিয়ে পড়ল অখিল বাউল আর বাকিরা। কেউ আর কথা কইতে পারলো না। আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সুষমা, মালা, চন্দনা আর রাধাকে নিয়ে গেল।

ওরা চিৎকার করছিল। শুনলো না। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। বুড়ো মানুষ ওদের সঙ্গে পারব কেন?

— কেবল বলতে ইচ্ছে করছিল, ওরে কতদিন রাত জেগে তোরা আমাদের গান শুনেছিস। বলেছিস, তোমাদের গানের গলা বড় মিঠে গো। বলেছিস, তোমাদের এই জায়গাটা বড্ড শীতল। মনে হয় দিনরাত শুয়ে থেকে কাটিয়ে দি। ওরে তোরা এখন বলে যা আজ কি করে আমরা দেশের শত্রু হলাম। একথা তো তোরা আগে একদিনও বলিসনি? ওরা চলে যেতে বুকটা আমার পাথর হয়ে গেল সই। সব লাশগুলো টেনে টেনে নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। ঘরের আগুন তখনো নেভেনি। জ্বলছিল ধিকিধিকি। আমি গাছের নিচে দু'রাত কাটালাম। তারপর তোর কথা মনে হলো। শুরু হলো বৃষ্টি। মানলাম না। বৃষ্টি মাথায় করে চলে এলাম। বড্ড শীত করছে রে সই।

— চল কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বি।

সেই শোয়াতে পনের দিন কাটিয়ে দিল নীতা। জ্বরে গা যেন পুড়ে যায়। বুড়ি কি করবে দিশে পায় না। গাঁয়ের কবরেজ ডেকে ওষুধ দেয়। মাথায় পানি ঢালে। বেহুঁশ অবস্থা নীতার। যমে মানুষে টানাটানির পর পনের দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ে। দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, সই আমার কি হয়েছিল?

— জ্বর।

বুড়ি হেসে ফেলে।

— হাসছিস কেন? তোর এখানে ক'দিন কাটালাম রে?

— এই তো দিন পনের।

— দিন পনেরো? নীতা অনেক কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। মাথা আবার এলিয়ে দেয়। বুড়ি সাগু গরম করে এনে খাওয়ায়। ধরে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। নীতা হলুদ নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে আকাশ দেখে। গাছ-গাছালির মাথার ওপর সূর্যের আলো দেখে। কণ্ঠে গান গুনগুনিয়ে উঠতে চায়। দমে কুলোয় না। বুড়ি এসে পাশে বসে। নীতার জন্যে ও পুকুর থেকে শিং মাছ ধরিয়েছে। থানকুনি পাতা দিয়ে তার ঝোল রেঁধেছে। আজ ওকে ভাত দেবে। বুড়ির মন বেজায় খুশি। নীতাকে ও বাঁচাতে পেরেছে।

— আজ তোকে ভাত দেব সই।

— ভাত খেতে ইচ্ছে করে না।

— ইচ্ছে না করলে কেমন হবে? গায়ে বল করতে হবে না?

— আর বল? নীতা ফিকে হাসে। আমার সব বল ওরা কেড়ে নিয়েছে।

— বাজে কথা। তুই আবার বেঁচে উঠেছিস সই। এ কটা দিন যে কেমন করে কেটেছে একমাত্র আল্লাহ জানে।

— তোর খুব কষ্ট হয়েছে না রে?

— ধুত কি যে বলিস?

নীতা চুপ করে থাকে।

— আমার দোতারাটা পুড়ে গেছে। অখিলেশদা ও বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। জোড়াগুলো পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেলেছে।

নীতা যেন আপন মনেই কথা বলে।

— যারা আমাদের গান ভালবাসতো তারা আমাদের শত্রু বলে কেন? আমরা কোন অপরাধে শত্রু হলাম? আমাদের মেয়েগুলোকে নিয়ে যেতে ওদের একটুও বাধলো না! এই বুঝি ওদের দেশপ্রেম?

— তুই কেবল ওদের কথা ভাবছিস কেন সই? ওদের মত আমাদের আরো অনেক ছেলে আছে যারা যুদ্ধ করছে?

— যুদ্ধ? সই দেখিস দেশ একদিন স্বাধীন হবে।

নীতা আবেগে উত্তেজনায় বুড়ির হাত চেপে ধরে।

— তোর ছেলে যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশে ফিরে আসবে। কিন্তু তখন আমি কোথায় যাব? আমার ঘর নাই, মানুষ নাই, কেউ নাই। এই হলদী গাঁ ছেড়ে আমার কোথাও যেতে মন চায় না রে সই।

— এখন এসব কথা থাক। তুই আগে সুস্থ হয়ে নে।

— তোর ছেলে ফিরে এলে ওকে বলবি গাঁয়ের মাথায় আমাকে একটা চালা তুলে দিতে। যে কটা দিন বাঁচি ভিক্ষে করে দিন কাটিয়ে দেব। এই গাঁ ছেড়ে অন্য আখড়ায় আমি যাব না রে সই।

নীতা হু হু করে কেঁদে ফেলে।

— এখন তুই আমার কাছে থাকবি। আমি একলা একলা থাকি তোকে পেয়ে আমার কি যে ভরসা হচ্ছে। তোকে আমি ছাড়ছি না।

— শরীরের যা অবস্থা! হাঁটিতেই তো পারি না। যাব আর কোন চুলোয়।

নীতা অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলে।

— যাই তোর ভাত নিয়ে আসি।

বুড়ি নীতার কান্না দেখতে চায় না। ওর সামনে থেকে উঠে পড়ে। নীতা জ্বরের ঘোরে বলতো, আমরা পথঘাটের মানুষ। ঘরের মায়া নেই। তবু বুকটা এমন হু হু করে পোড়ে কেন বলতো সই? শান্তি কমিটির নামে ওরা কত জাত ভায়েদের মারলো, ঘর পোড়ালো, মা বোনের সম্ভ্রম নিলো— ওরা এই মাটির শত্রু নয়, হলাম আমরা।

বুড়ি ভাত বাড়তে গিয়ে থমকে যায়। নীতার সব গেছে তাতে ওর দুঃখ নেই ওর বুক খাক্ হয়ে যাচ্ছে আলী আহমদের ঐ একটা কথায়। ঐ কথায় ওর সারা জীবনের ভিত নড়ে উঠেছে। অথচ দুঃখ নেই আলী আহমদের। ওরা নির্বিবাদে দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। রইস এসে রান্নাঘরে ঢোকে। ইশারায় কিছু কথা বলে। বুড়ি তাড়াতাড়ি কাঠের চামচ দিয়ে ভাত ওঠায়।

নীতা এখন একদম ঘর থেকে বের হয় না। একদিকে ভয় অন্যদিকে শারীরিক দুর্বলতা। গুলি, মৃত্যু, আগুন নীতার সব সাহস ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। ওর কণ্ঠের গান এখন বুড়ির ঘরের দেয়াল পেরোয় না। মুখে হাসি নেই নীতা স্থবির হয়ে গেছে।

— তুই এমন ভেঙে পড়লি কেন সই?

— এত মৃত্যু আমি কখন দেখিনি রে। নীতা অন্যমনা হয়ে বলে।

— আমিও কি দেখেছিলাম।

বুড়ির কণ্ঠও খাদে নেমে যায়। তবু ওর সঙ্গেই দু'চারটে কথা বলে বুড়ির সময় ভালই কাটে। মনসুর একদিন বাঁশবাগানে বুড়ির পথ আগলে দাঁড়ায়, কি গো রইসের মা বৈরাগিণীটা নাকি তোমার এখানে এসে জুটেছে?

— জুটেনো কৈ? একা একা থাকি তো তাই আমিই কটা দিন রেখে দিলাম। ও তো রোজই চলে যেতে চায়। বুড়ো মানুষ আমারই বা ভরসা কি বল?

— না বাপু ওকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর নইলে তোমারই আবার বিপদ হবে।

বুড়ি হি হি করে হেসে ওঠে।

— বিপদের আর বাকী কি? সংসার আমার মানুষ-শূন্য হয়ে গেল। উড়ো খবর পাই সলীমও নাকি যুদ্ধে মরেছে।

— তাই নাকি?

মনসুর লাফ দিয়ে বুড়ির কাছে সরে আসে।

— তা খবরটা কার কাছে পেলে।

— এ ও বলে।

বুড়ি চোখে আঁচল চাপা দেয়।

— আহা কেঁদ না রইসের মা। বড় দুঃখের কপাল তোমার। নিজের ছেলেটাও হল হাবা আর বোবা। কোন কাজেই এলো না। থাকি দুঃখ করো না। আমরা তো আছি। দরকার হলে খবর দিও। তবে হ্যাঁ ঐ বোষ্টমীটাকে আজই বিদায় কর।

— তা আর বলতে।

— যাই মেলা কাজ। সাবধানে থেক রইসের মা।

মনসুর ছাতা মাথায় মেঠো পথে নেমে যায়। একটু পর ঘুরে আসে আবার।

— হ্যাঁ গো রইসের মা সলীমের খবরটা সত্যি তো?

— লোকে তো বলে। নিজের চোখে তো আর দেখিনি।

— তা তো ঠিকই। ওদের নিয়ে তোমারও আদিখ্যেতা আছে বাপু। তা আমি বলি সত্যি ছেলে দুটো গেছে তোমার ভালই হয়েছে। সম্পত্তি সব এখন তোমার রইসের। কি খুশি লাগছে না?

বুড়ির দম আটকে আসে। শক্ত হয়ে যায় শরীর।

— বুঝলে খুশিটা আমারও। যাই সলীমের খবরটা পৌঁছে দেই ক্যাম্পে।

মনসুর হনহনিয়ে হেঁটে যায়। বুড়ি থু করে একদলা থুতু ফেলে। ওর সঙ্গে কথা বলতেও শরীর কেমন ঘিনঘিন করে। শকুন! শকুন একটা। বুড়ি অকারণে কাঁটা ঝোপে লাথি মারে। সলীম ফিরে এলে তোর হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে। তোকে কুকুরের মুখে, শিয়ালের মুখে তুলে দেব আমি। উঃ সলীমের খবরটায় কেমন লাফিয়ে উঠলো শুয়োরটা। মাগো মাথা আমার খারাপ হয়ে যাবে। মিথ্যে [illegible] বলে ওকে ধোঁকা দিয়ে এখন নিজের বুকের মধ্যে কেমন ছটফট করছে। সলীম আমি তোকে পেটে ধরিনি ঠিকই কিন্তু তবুও তোর মা হয়ে বলছি আমার মুখে ঝাঁটা পড়ুক। তোর শত বছর

পরমায়ু হবে রে। সলীম বিশ্বাস কর ও যাতে আমাকে আর নীতাকে না ঘাঁটায় সেজন্য মিথ্যে বলেছি। বুড়ির অস্বস্তি তবু কাটে না। কেন এমন হঠাৎ করে সলীমের মৃত্যুর খবর মনে এল? সলীম তোর যুদ্ধের দোহাই, তোর মুক্তিযোদ্ধাদের দোহাই আমার মনে একটুও পাপ নেই রে। আমি সম্পত্তি দিয়ে কি করবো, ঐসব আমার চাই না।

বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে ঘরে ফিরে। বিড়বিড় করতে করতে ভাত চড়ায়। সারাদিন বুড়ি আচ্ছন্নের ঘোরে কাটিয়ে দেয়। নীতার সঙ্গেও কথা বলতে পারে না।

— তোর কি হয়েছে সই?

— আমি রটিয়ে দিয়েছি সলীম যুদ্ধে মরেছে। বুড়ি অবিচল কণ্ঠে বলে।

— কেন এমন করলি?

— সলীম মরে গেলে ওরা খুশি হবে। তাহলে আমাকে আর বেশি ঘাঁটাবে না। তোর এখানে থাকা নিয়ে কথা বলবে না। জানিস নীতা এখন ঐ সৈনিকগুলোর চাইতে আমি মনসুরকে বেশি ভয় পাই রে। ও আমার ঘরের কাছের লোক। ও আমার হাঁড়ির খবর রাখে।

বুড়ি সারাদিনের পর এতক্ষণে কেঁদে ফেলে। নীতা বুড়ির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুড়িকে বুঝতে পারে না। ওর মুখের রেখা পড়তে পারে না। বুড়ি এখন নীতার কাছে অচেনা এক মেয়েমানুষ।

বুড়ির রটনা বাতাসের বেগে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে যায়। মনসুর পথে পথে যাকে পেয়েছে তাকেই সোল্লাসে খবর দিয়েছে। যারা সলীমের বিজয়ীর বেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে তারা চুপি চুপি বুড়ির কাছে আসে।

— খবরটা কি সত্যি রইসের মা?

— হ্যাঁ।

বুড়ি গলা না কাঁপিয়ে উত্তর দেয়।

— খবরটা আনল কে?

— একটা ছেলে। চিনি না।

রমজান আলী শুনে গর্জে ওঠে।

— মিথ্যে কথা। নিশ্চয় সলীম মরেনি। এটা ঐ মনসুরটার বানানো কথা।

বুড়ি রমজান আলীর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ওর কণ্ঠের গর্জনে স্বস্তি পায়। সে কণ্ঠ বুকের ভেতর ধরে রাখে। ঘরের ভেতর থেকে নীতা অনবরত চোখের জল মোছে। মনে হয় বুড়ির কাছাকাছি পৌঁছার সাধ্য এখন আর ওর নেই।

এইসব টানাপোড়েনে দিন কেটে যায়। বুড়ির বুকের দিগন্ত অনবরত প্রসারিত হয়। হলদী গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে যায়। গুলির শব্দের জন্যে কান খাড়া করে রাখে। কখনো রমজান আলী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কথা বলনা কেন রইসের মা? সলীমের খবরটা কি তোমার কাছে বাতাসে ভেসে এলো, তোমার কাছে কে এসে খবর দিয়ে গেল আর আমরা কিছুই জানলাম না এটা হয় নাকি?

বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। রেগে যায় রমজান আলী।

— তোমাকে যে কোন ভূতে পেয়েছে আল্লাহই জানে?

বুড়ি রমজান আলীর দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়া দেখে। দেখতে ভাল লাগে। বিড়বিড় করে, চারদিকে এমন দুপদাপ শব্দই তো আমি চাই। বুড়ি অনুভব করে বুকের সীমানায় গলগলিয়ে জনস্রোত ঢুকছে। ওর ভাবনার মাঠঘাট প্রান্তর স্বর্ণপ্রসবিনী করে তুলছে। বুড়ির পলিমাটি চেতনায় রাশি রাশি শস্যের কণা।

শুধু বাঁশবনে বা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মনসুর যখন বিগলিত হেসে গদগদ স্বরে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ রইসের মা? তখন বুড়ির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘৃণার চাবুক লিকলিকিয়ে ওঠে। ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। একদলা থুতু ফেলে। মনসুর সহানুভূতি জানায়, আহা তোমার কি এখন মাথার ঠিক আছে? সতাই ছেলে হলেও তুমিই তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছ।

বুড়ি কথা শেষ করার আগেই হাঁটতে শুরু করে।

— ও রইসের মা? রইসের মা?

মনসুর জবাব না পেয়ে ফিরে যায়। বুড়ি গরুর খুঁটি আলগা করে বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে বুনো লতায় সপাং সপাং পিটায়। বুড়ির শরীরের র-র দপদপানি কমে না।

পৌষের প্রথম রাতে গোলাগুলির ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ওদের। বুড়ি গায়ের কাঁথা ছুড়ে ফেলে উঠে বসে। নীতাও গুটিসুটি উঠে আসে। ওর শরীর কাঁপে।

— কি হল সই?

— ঠিক আমাদের গাঁয়ের ক্যাম্পে আক্রমণ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা!

— মাগো এখন কি হবে?

নীতা কাঁদতে শুরু করে।

— কি আর হবে, জঙ্গী ছেলেগুলো শীতের রাত গরম করে তুলেছে।

রইস কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে আর জাগায় না। বুড়ি বাঁশের ঝোপের কাছে এসে বসে। বুক দুরুদরু করে, এত কাছ থেকে এমন শব্দ কি ও আর কখনো শুনেছে! শব্দ ক্রমাগত জোরালো হয়। আশপাশের ঘরের লোকজনের ফিসফাস কথাবার্তা শোনা যায়। সব ভয়ে আতংকগ্রস্ত। তটস্থ মেয়েরা ছেলে বুকে নিয়ে পালাচ্ছে। পুবদিকে সরে যাচ্ছে। অন্ধকার রাতে পথ চলায় একটুও অসুবিধে হয় না। বরং অন্ধকারই ভাল। চারদিকের এত আঁধারের মাঝেও বুড়ির বুকের ভেতর প্রদীপ জ্বলে। রমজান আলী এসে বুড়িকে ডাকে।

— ও রইসের মা?

— কি!

— এখনি পালানো দরকার।

— কেন?

— যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা সরে যাচ্ছি। যুদ্ধ থামলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।

— কি যে বল রমজান ভাই! আমাদের ছেলেরা জিততেও তো পারে।

— জিতলে তো ভালই। না জিতলে? এখনই চল। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

— আমার আর কি হবে? আমি যাব না।

— কি যে বল?

— না রমজান ভাই না। তুমি যাও। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। এই শীতের রাতে ওকে নিয়ে কোথায় যাব?

— মরণের শখ হয়েছে তোমার? তাড়াতাড়ি এস।

— না।

— যাবে না?

— না, রমজান ভাই। আপনি যান।

রমজান আলী রাগ করে চলে যায়। কলীমের মৃত্যুর কথা মনে হয় বুড়ির। ঘর থেকে উঠোনের ঐ জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। বুকটা কেঁপে ওঠে। গুলির শব্দ মানেই মৃত্যু। নীতাও তা জানে। তবুও বুড়ি চুপচাপ বসে থাকে।

— সই?

নীতার কণ্ঠে বুড়ি চমকে ওঠে। ওর হাত চেপে ধরে।

— সই তুই ওদের সঙ্গে চলে যা। সত্যি যদি কিছু হয়?

— তোকে ছেড়ে আমি যাব? তুই কি করে বললি?

— তাহলে দু'জনে বসে থাকি। দেখি শেষ কোথায়।

বুড়ি কান পেতে প্রাণ ভরে শব্দ শোনে। এমন শব্দময় উষ্ণ রাত বুড়ির জীবনে আর কোন দিন আসেনি।

কাদের আর হাফিজের নেতৃত্বে মিলিটারি ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছে একদল মুক্তিযোদ্ধা। প্রথমদিকে ওরা চমৎকার পজিশনে ছিল। অতর্কিত আক্রমণ বলে বেশ কয়েকটা মেরেও ফেলে। কিন্তু সংখ্যায় কম ছিল বলে ওরা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তার ওপর ওদের গুলিও ফুরিয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে ওরা পালাবার চেষ্টা করে। অন্ধকারে এক একজন এক একদিকে দৌড়ায়। কাদের হাফিজ গাঁয়ের পথ চেনে। চেনা পথে ওদের অসুবিধা হয় না। শুধু এলোমেলো পথ ঘাটে কখনো পা বেঁকে যায়। ওদের পেছনে ধাওয়া করে চারজন মিলিটারি। পেছন থেকে ওরা গুলি ছোঁড়ে। কানের পাশ দিয়ে আগুনের ফুলকি হলকা ছড়িয়ে যায়। কাদের আর হাফিজ প্রাণপণে ছুটছে। সৈনিকদের দৃষ্টি এড়াতে ওরা সোজা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়।

উঠানে দুপদাপ শব্দ। দুলে ওঠে বুড়ির বুক। ওরা কি তবে পালিয়ে এল? যুদ্ধ কি শেষ? গুলির শব্দ আর তেমন জোরালো নয়। ফাঁকা আওয়াজ ভেসে যায় শূন্যে। পাল্টা জবাব আর গর্জে ওঠে না। বুড়ির বুক খালি হয়ে যায়। ওরা কি তবে হেরে গেল? ও নীতার হাত চেপে ধরে।

— সই ওরা কি হেরে গেলো? ওরা হারতে পারে না। আমার বিশ্বাস হয় না।

বুড়ি ফুঁপিয়ে ওঠে। নীতার হাঁটু কাঁপে থর থর করে। বারান্দায় উঠে এল ওরা। বুঝি ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

— চাচি?

বুড়ির বুক কাঁপে। কে ওরা? চেনা ছেলে মনে হয়?

— চাচি দরজা খোলেন।

অস্থির কণ্ঠ। এক মুহূর্ত দেরি সইছে না। বুড়ি তৈরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখনই প্রকৃত সময়। ওরাই এসেছে। সেই বীর যোদ্ধা ছেলেগুলো। ওরা আশ্রয় চাইছে। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিরাপত্তার আশ্বাস চাইছে। ওদের আশ্রয় দেয়া দরকার। একবার পালিয়ে এসেছে তাতে কি হয়েছে? ওরা আবার নতুন করে যুদ্ধে নামবে। শক্তিমান ঈশ্বরের মত মনে হয় নিজেকে। বুড়ি দরজা খুলে দেয়।

কাদের আর হাফিজ হুড়মুড়িয়ে ঢোকে।

— ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে চাচি। তাড়া করে আসছে। বাবা মা কে তো পেলাম না। আপনি আমাদের আশ্রয় দেন চাচি।

মিনতিতে ভেঙে পড়ে কণ্ঠ। বুড়ি জানে না প্রার্থনার ভঙ্গি এমনি কি না। এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না। ওরা যদি বুক টান করে বলতো, আমাদের বাঁচাও। তাতেই বুড়ি বিগলিত হয়ে যেত। বুড়ি জানে ওদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। হলদী গাঁয়ের প্রাণ এখন ওদের হাতের মুঠোয়। ওদের বাঁচাটা মাটির মত প্রয়োজন। বুড়ি কর্তব্য ঠিক করে নেয়। ওদের টেনে নিয়ে যায় ঘরের কোণে। খালি হয়ে পড়ে থাকা বড় মটকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। মুখে ঢাকনা দেয়। ঢাকনার ওপর টুকরি। টুকরির ওপর পুরোনো কাপড়ের পুঁটলি।

নীতা হাঁ করে দেখে কেবল। বুড়ি ফিরে এলে ডাকে, সই! বুড়ি পরিতৃপ্তির হাসি হাসে।

— ওদের না বাঁচালে আমাদের জন্যে লড়বে কে?

বুড়ি আবার ঝাঁপের কাছে বসে। রমজান আলী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তবে সবাই যায়নি। বুড়ির মত আরো কেউ কেউ রয়ে গেছে। একবার মার খেয়ে রমজান আলীর সাহস কমে গেছে। ওর কথা শুনে বুড়িও যদি পালাতো তবে কে ওদের আশ্রয় দিত? বুড়ি জানে এই কঁ'ঘর বাসিন্দার মধ্যে আর কারো এত সাহস হতো না। গর্বে, ভয়ে, আশংকায়, আনন্দে বুড়ির বুক ওঠানামা করে। এখন কি করবে? ওরা যদি খোঁজ করতে আসে? আসে নয় আসবেই। বুড়ির মনে হয় বিশাল অরণ্যে ও একা। চারদিক থেকে নেকড়ের দল বন-জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসছে আক্রমণ করতে। শিউরে ওঠে বুড়ি। কিছুই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কি করা উচিত? পথ আগলে দাঁড়াবে? বলবে, আগে আমাকে মার তারপর ঘরে ঢোকো? কিন্তু তাতে লাভ? ছেলে দুটো কি তাতে বাঁচবে? বুড়ির মৃত্যুর বিনিময়ে তো ওরা বাঁচবে না? কি করবে? কি করা দরকার? মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। ওর ওপর নির্ভর করছে ওদের জীবন-মৃত্যু। ওদের বেঁচে থাকা একান্তই দরকার।

বুড়ি নীতাকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

– কি করি সই? কেমন করে ওদের বাঁচাব?

নীতা কথা বলে না। আঁচলে চোখ মোছে। বুড়ি রেগে যায়।

– তোর কেবল চোখে জল। সব হারিয়ে তুই শিখেছিস কাঁদতে? একটুও ভাল লাগে না।

বুড়ি ঘরে পায়চারি করে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারজন সৈনিক ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। সার্চ লাইটে আলোকিত করে ফেলে চারদিক। এত ঝকমকে আলো হলদী গাঁয়ের এই ক'ঘর বাসিন্দা ওদের জীবনকালে দেখেনি। সৈনিকগুলো চিৎকারে বাড়ি মাথায় তোলে। ওরা বুঝতে পারছে না যে ছেলেগুলো কোনদিকে গেল? ঘরে ঢুকলো না বাঁশবন, সুপোরি বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিল? ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। তারপর দুজন ঘরে ঘরে তল্লাসী শুরু করে। অন্যান্য ঘরের পুরুষদের উঠানে এনে দাঁড় করিয়েছে। বুড়ির হাত পা থরথর করে কাঁপে। বাঁশবনে চুপ করে বসে থাকা সাদা বকটার মত মনে হয় মৃত্যুর ছায়া। ঘরের বাইরে বাদাম গাছে পেঁচা ডাকে থেকে থেকে।

বুড়ি সারাঘরে পায়চারি করে। এক কোণে কুপি জ্বলে। রইসের মুখ থেকে কাঁথা সরে গেছে। এত হট্টগোলেও ওর ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। ঘুমের মধ্যে গোঙায়। এটা ওর একটা অভ্যেস। বুড়ি ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের ওপর। হ্যাঁ, ঠিক সেই গন্ধ আসছে। কাদের হাফিজ যেদিন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছিল সেদিন ওদের শরীর থেকে যেরকম গন্ধ এসেছিল ঠিক সে রকম গন্ধ আসছে রইসের মুখ থেকে। চারদিক আলো করে কারা যেন বুড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ি দৈববাণী শুনতে পাচ্ছে। ফিসফিস করে বলছে, আর সময় নেই। বুড়ির মনে হয় প্রতিটি মুহূর্তই যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুমের ঘোরে রইস পাশ ফিরে শোয়। চকিতে একটা চিন্তা এসে বুড়িকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

নীতা দ্রুত বলে, সই আজ আমাদের সবাইকে মরতে হবে। বুড়ি ওর কথার উত্তর দেয় না। ওর কেবলই মনে হয় যে ছেলে জনযুদ্ধের অংশীদার হতে পারে না যে ছেলে ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে না তার বেঁচে থেকে লাভ কি? কত হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। রইসও যদি যায়? না, পরক্ষণে মনটা মুষড়ে পড়ে। রইস ছাড়া বুড়ির পৃথিবী অন্ধকার। সব হারিয়ে কেমন করে বাঁচবে ও? পরক্ষণে সমস্ত হলদী গাঁ চোখের সামনে নড়ে ওঠে। বিরাট একটা ক্যানভাসে বুড়ির শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং সেই সঙ্গে নেংটি পরা মানুষগুলো উঠে আসে সামনে। ওদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, আছে কেবল বুকভরা তেজ। তাই বুড়ির একার স্বার্থ ওখানে সামান্য। বুড়ি চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। ওদের কথা শো শোনা যায়। বুঝি ওর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। ও আর দেরী করে না। ঘুমন্ত রইসকে টেনে তুলে আনে বিছানা থেকে। চারদিকের এত আলোয় ও হকচকিয়ে যায়। বুড়ি লুকিয়ে রাখা এল.এম.জি. টা গুঁজে দেয় রইসের হাতে। রইস অবাক হয়ে একটুক্ষণ দেখে নতুন

জিনিসটাকে। মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মাথা নাড়ে। এবং ভীষণ খুশিতে খেলনা ভেবে অস্ত্রটা জড়িয়ে ধরে বুকের মাঝে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ির সমস্ত শরীর কেঁপে যায়।

— নীতা তীব্র কণ্ঠে বলে, কি করছিস সই?

ও রইসের হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিতে চায়। বুড়ি ক্ষিপ্রগতিতে সামনে এসে দাঁড়ায়, না। তুই ওটা নিতে পারবি না। ওটা রইসের বুকেই থাকুক। আমি ওকেই দিয়েছি।

বুড়ির দৃষ্টি দপদপিয়ে ওঠে। চোখে জল নেই।

সৈনিক দু'জন বুড়ির বারান্দায় ওঠার সময় পায় না। পা সিঁড়িতে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ি রইসকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দেয়। সৈনিক চারজন কলরব করে ওঠে। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ি। ওদের কিছুতেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। ঢুকতে হলে বুড়ির লাশ মাড়িয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু রইসকে পেয়ে সৈনিক চারজন আর অন্য কিছু ভাবে না। অত ভাবার ধৈর্য ওদের নেই। ওদের সোল্লাস মুখের দিকে তাকিয়ে ওর দম আটকে আসতে চায়। নিঃসীম বুকের প্রান্তরে হু হু বাতাস বয়ে যায়। বুড়ি হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারে না। ছুটে বেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো দুটো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দুটো উপেক্ষা করতে পারে না। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রইসের একলার মা নয়।

সৈনিক ক'জন তাদের নিজস্ব ভাষায় বুড়িকে ধন্যবাদ জানায়। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। দেশের জন্যে সত্যিকার কাজ করেছে বলে পুরস্কার দেবার কথাও বলে। বুড়ি এক অক্ষরও বুঝতে পারে না। নির্বাক পুতুলের মত দরজা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের হাতে বন্দী রইস কেবল নেড়েচেড়ে অস্ত্রটাই দেখে। কারো দিকে তাকাবার সময় ওর নেই। উঠানে দাঁড় করানো লোকগুলো সব থ। কারো মুখে কথা নেই। ওরা বুঝতে পারছে না যে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। হাবা-বোবা রইসের হাতে অস্ত্র দেখে কেউ প্রতিবাদও করে না। সব চুপ। ওরা কেবল অনুভব করে বুড়ির চোখ দুটো জ্বলছে। চোখের অমন আলো ওরা আর কোথাও দেখেনি। কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখে রইসকে লুফে নিয়ে ওরা চলে যায়। আকাঙ্ক্ষিত শিকার এখন ওদের হাতের মুঠোয়। শিকার ঝলসানোর জন্যে ওরা এবার আগুন জ্বালাবে। ওরা চলে যাচ্ছে। বুড়ি অনুভব করে ওর কলজেটা খাবলে নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে।

বুড়ি দরজা ছেড়ে বারান্দায় নামে। সিঁড়ি বেয়ে উঠানে। রাত্রি প্রায় শেষ। আবছা আলো চারদিকে। পঁ্যাচার ডাক থেমে গেছে অনেকক্ষণ। উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বুড়িকে ঘিরে ধরেছে। কত কি যেন বলছে। বুড়ি কিছুই শুনতে পায় না। ওদের ভিড় সরিয়ে উঠানের শেষ মাথায় আসে এবং পরক্ষণেই শুনতে পায় গুলির শব্দ। বুড়ি দৌড়ে বের হয়। কলীমের লাগানো জামরুল গাছের নিচে রইস রক্তের

স্রোতে ভাসছে। ও বেড়া আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বুকের ভেতরের পুলটা দুম্ করে ভেঙে পড়লো। রইস একটা টিকটিকে লাল তাজা বোমা। চারজন সৈনিক সদম্ভে মাটি কাঁপিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে।

যখন বাড়ির সবাই রইসের দিকে ছুটে গেল তখন বুড়ি আবার দৌড়ে ঘরে এলো। ধানের মটকার মুখ খুলে ওদের ডাকল। ওরা বেরিয়ে এলো। মনে আশংকা। শংকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। বুঝতে পারে না কিছুই।

— ওরে তোরা পালা। ওরা চলে গেছে।

— চলে গেছে?

ওদের বিশ্বাস হয় না। নীতা বৈরাগিণীর উঁচুকণ্ঠের কান্না ভেসে আসছে।

— কাঁদে কে চাচি?

— তোদের এত কথার সময় নেই। তোরা এখন পালা তোদের তো আবার লড়তে হবে।

বুড়ির কণ্ঠ রুক্ষ হয়ে ওঠে।

— আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম চাচি।

— খালি কথা। যা এখন।

বুড়ি ওদের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়। বুকের ভেতর থেকে কান্নার ঢেউ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু ওদের সামনে কিছুতেই তা প্রকাশ করবে না বুড়ি।

ওরা বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। দ্রুত বাইরে আসে। মৃত রইসকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। ওদের কোরবান চাচার কাছে সব শুনে বধির হয়ে যায় ওদের অনুভূতি। পায়ে পায়ে ফিরে আসে বুড়ির সামনে। বুড়িকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

— আপনার একটি মাত্র ছেলে। আমাদের জন্যে এ আপনি কি করলেন?

— তোদের যে আরো লড়তে হবে।

— তবু ওদের কান্না থামে না। বুড়ি ওদের হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধার চোখে পানি বেমানান।

— এখনও না পালালে তোরাও ধরা পড়বি। আর সময় নেই রে। তোরা যদি ধরা পড়িস বৃথাই রইস মরল। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।

বুড়ির কঠিন শাসনে ওরা আর দ্বিধা করে না। মনে হয় বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ওদের নেই।

— মাগো যাই।

ওরা দুজন দৌড়ে বেরিয়ে যায় বুড়ি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। প্রবল কান্নার ধ্বনি আসছে জামরুল গাছের নিচ থেকে। সবাই কাঁদছে। বুড়ির বুক তোলপাড় করে ওঠে।

— তুই আমাকে একদিনও মা বলে ডাকিসনি রইস। আমি জানি একটু পরে হলদী গাঁয়ের মাটি তোকে বুকে টেনে নেবে। তুই আর কোনদিন মা বলে ডাকবি না। আমিও আর অপেক্ষায় থাকব না। কৈশোরে, যৌবনে যে স্বপ্ন আমাকে তাড়িত করতো—

বার্ধক্যে যে স্বপ্ন আমি মুছে ফেলেছিলাম এখানেই তার শেষ। রইস তুই আমার কত আদরের কত ভালবাসার কত সাধনার ধন রে! তবু তোকে নিয়ে আমার বুকে কাঁটা ছিল, আজ আমি তোর রক্তে সে কাঁটা উপড়ে ফেললাম। তোর অপূর্ণতা— তোর অভাব আমি আমার জীবন দিয়ে শোধ করলাম। তুই মরে বেঁচে গেলি। আমি রইলাম তোর শোক বহন করার জন্যে। রইস আমি তোর মা ডাক না শোনা মা। আমি কত নির্মম, নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তা তুই বুঝতে পারিসনি। আমি তো জানি যে কটা দিন বাঁচবো তোর কষ্টে বুক পুড়িয়ে বাঁচবো। তবু এই কষ্ট থেকে আমি পার পেয়ে যাইরে যখন দেখি হলদী গাঁতো আমারই নিঃশ্বাসের। আমারই প্রতি রোমকূপের। আমি তখন আর সব কিছু ভুলে যাই। রইস তোর মাতৃত্বে আমার যে অহংকার— হলদী গাঁও আমার তেমন অহংকার। রইস তুই আমাকে মাফ করে দে। মাফ করে দে।

বুড়ি বেড়ার গায়ে মাথা ঠুকে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। নীতা এসে দাঁড়ায়।

— সই?

বুড়ির কান্না থামে না।

— সই চল, দেখবি না বুক পিঠ কেমন ঝাঁঝরা হয়েছে? রক্তে মাখামাখি হয়ে কেমন পদ্মের মত ফুটে আছে তোর রইস?

নীতার কথায় বুড়ি শক্ত হয়ে যায়। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

— হাঁ করে দেখছিস কি? চল। নাড়ি ছেঁড়া ধন চাই বলে পাগল হয়ে উঠেছিলি। তাকে আজ নিজ হাতে বলি দিয়ে কাকে তুষ্ট করলি সই?

বুড়ি কোন কথা বলে না।

নীতার প্রশ্নের উত্তর হয় না। বুড়ির ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া বুক এখন সমতল পলিমাটি। অনবরত বন্যায় ক্রমাগত উর্বরা হয়। খরায় নিরেট তবুও শ্যামল খাল বিল নদী নালাময় বুড়ির বুকে আশ্চর্য পদ্মের সৌরভ।

— চল সই?

নীতা বুড়ির হাত ধরে নিয়ে আসে।

বুড়ি রইসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। জনযুদ্ধে উপেক্ষিত ছেলেটার উষ্ণ তাজা রক্ত হাত দিয়ে নেড়ে দেখে। রইসের ঠোঁটের কোণে লালা নেই। লালচে ক্ষীণ রেখা গড়াচ্ছে। রক্তের থেকোয় কাত হয়ে পড়ে থাকা রইসের মাথাটা সোজা করে খুব আস্তে খোলা চোখের পাতা বুজিয়ে দেয় বুড়ি।

কারা যেন চারপাশে কথা বলছে। কেউ বুড়িকে গালাগালি করছে। ওর মনে হয় সলীম বুঝি ফিরে এসেছে। মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত বুড়ির আর কোন কিছুই মনে থাকে না।